KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher: নীরদ চক্রবর্তী
Title: [illegible]	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ৪০/১ ৪০/২ ৪০/৩ ৪০/৪	Year of Publication: বৈশাখ ১৩৯৬ // May 1989 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ // Jun 1989 আষাঢ় ১৩৯৬ // July 1989 শ্রাবণ ১৩৯৬ // Aug 1989
	Condition: Brittle / Good ✓
Editor: আব্দুর রউফ	Remarks:

C.D. Roll No.: KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ প্রথম সংখ্যা মে ১৯৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বাক্-স্বাধীনতার সুযোগের অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে সাহিত্যিক নিজের আখের গুছিয়ে নিতে তৎপর হলে সাহিত্যের চিরন্তন মানবমমত্ববোধের আবেদন কি ভাবে উপেক্ষিত হয় এই নিয়ে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ "সাহিত্য, সমাজ দায়িত্ব, রশ্‌দির দুর্মতি।"

যে রাষ্ট্রিক আন্দোলন মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সাধনাবিমুখ, রবীন্দ্রনাথের "স্বধর্ম" কেন ছিল তার বিরুদ্ধে ? আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সেই আলোচনা করেছেন ড· শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

"পতিতা" থেকে "ল্যাবরেটরি" রবীন্দ্রগল্পে "পুরাণের রূপান্তর" নিয়ে ডঃ রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নিবন্ধ।

জমিদারি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক করুণাময় মুখোপাধ্যায়।

"তাসের দেশ" নাটকটি কি ঐতিহ্যাগত যুক্তিহীন প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী অভিযানের ফসল ? এই নিয়ে ড· পিনাকী ভাদুড়ীর যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণ।

শিবু ওরাওঁয়ের নেতৃত্বে ওরাওঁ উপজাতির সমাজসংস্কার আন্দোলন কেমন করে "তামাম দুনিয়াকে সংস্কার করার" আদর্শের রূপ নিয়েছিল, অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী এবার বলেছেন সেই ইতিহাস।

বাংলাদেশের চিত্রকলা নিয়ে শিল্পী সমীর ঘোষের আলোচনা।

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্খা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...
— শ্রীমা

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ১
মে ১৯৮৯
বৈশাখ ১৩৯৬

সাহিত্য, সমাজদায়িত্ব, রশদির দুর্মতি হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১

রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম এবং এদেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ১২

পুরাণের রূপান্তর : "পতিতা" থেকে "ল্যাবরেটরি" রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২৬

জমিদার রবীন্দ্রনাথ করুণাময় মুখোপাধ্যায় ৩৭

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৪৬

তাসের দেশের অচলায়তন পিনাকী ভাদুড়ী ৫৭

বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৬৪

রাষ্ট্রযন্ত্র মলয় রায়চৌধুরী ৮

অপচয় স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় ৯

প্রেম-অপ্রেমের কবিতা দাউদ হায়দার ১০

দহন আনন্দ ঘোষ হাজরা ১১

বন্দিনিবাস রবিশংকর বল ২০

গ্রন্থসমালোচনা ৬৭

রণেন্দ্রনাথ দেব, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর মৈত্র,
প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ, সন্তোষকুমার দে

চিত্রকলা ৮৪

পদ্মাপারের ছবি সমীরকুমার ঘোষ

মতামত ৯০

অনিলচন্দ্র সাহা, হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

ড. অশোক মিত্রের সম্পাদনায়
চতুরঙ্গের অর্ধশতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে
সংকলনগ্রন্থ

চতুরঙ্গের অর্ধশতবর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে পত্রিকা কর্তৃপক্ষের তরফে এই পত্রিকার অন্যতর প্রতিষ্ঠাতা আতাউর রহমানের পরম সুহৃদ আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. অশোক মিত্রের সম্পাদনায় এই পত্রিকায় প্রকাশিত অমূল্য রচনাসম্ভার থেকে কিছু বাছাই-করা লেখা নিয়ে একটি সংকলনগ্রন্থ এই বছরের মধ্যেই প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।

সাহিত্য, সমাজদায়িত্ব, রশ্‌দির দুর্মতি

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"চতুরঙ্গ" সম্বন্ধে একটু পক্ষপাতের উল্লেখ প্রথমেই করে রাখছি, কারণ সেখানেই এই লেখার সূত্রপাত। হয়তো পুনরুক্তি করছি, কিন্তু পত্রিকার প্রতি সংখ্যা পাওয়ামাত্র আদ্যন্ত পড়তে ইচ্ছা করে আর প্রায় সব লেখা থেকেই চিন্তার খোরাক মেলে। মার্চ '৮৯ সংখ্যায় দেখলাম আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের এক শিরোমণি যশ্‌পাল বিষয়ে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের সশ্রদ্ধ, সযত্ন রচনা, যাকে আর একটু গভীরতাস্পর্শী হলে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যেত। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল, যশ্‌পাল-এর সঙ্গে স্বল্প হলেও আমার পরিচয়, ১৯৪৬ সাল নাগাদ সময়ে পাটনা শহরে এক সম্মেলনে ডাক পেয়ে একত্র রাত্রিবাস, তাঁর কাছ থেকে "দিব্যা" উপন্যাসটি উপহার পাওয়া, আর পত্তনকাল থেকে প্রগতি-লেখক সংঘের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এবং সংঘের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা আমার বন্ধু সজ্জাদ জহীর-এর কল্যাণে হিন্দী-উর্দু 'সংসার' বিষয়ে আমার আগ্রহ এবং যোগাযোগ। যশ্‌পাল প্রসঙ্গেই মনে হল, হয়তো কয়েকটি কথা "চতুরঙ্গ"-পাঠকদের শোনাতে পারলে মন্দ হয় না। হঠাৎ এই পরিস্থিতিতে সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ এল একটি লেখার, যা সাহিত্য বিষয়ে হলেই তিনি খুশি হবেন। নক্ষত্রবিদ্যায় বিশ্বাস নেই, কিন্তু মজা একটু লাগল অনুরোধ পেয়ে আর জানালাম কিছু লিখে পাঠাব।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত বিচারে অনধিকারী হয়েও মানব যে আরও অনেকের মতো অনেক কাল ধরে "অদ্বারপ্রবেশ" (শব্দটি জেনেছি সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছ থেকে) অন্তত মাঝে-মাঝে করেছি। সচরাচর বাঙালি মনে সাহিত্য বিষয়ে একটা দুর্বলতা যে আছে তা সবাই জানি। এখন দিনকাল কিছুটা বদলাচ্ছে, কিন্তু 'হায় মা যাহারা তোমার ভক্ত / নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত!' বাক্যটি যখন কঠোরভাবে সত্য, তখনই সঙ্গে-সঙ্গে কবি গেয়েছেন : 'জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে / চাহি না অর্থ, চাহি না মান / যদি তুমি দাও তোমার ওচুটি / অমলকমল চরণে স্থান!' 'ওপার বাঙলা'-তে যে-অনুভূতি সর্বকলুষ-হরণ সৌরভ এনে দিয়েছে, তা 'এপার বাঙলা'-তে একেবারে না থাকতে পারে কি? ভট্টাচার্য মহাশয় যশ্‌পাল-প্রসঙ্গে 'প্রগতি'-ওয়ালাদের দু-একটা মোলায়েম খোঁচা দিলেও ক্ষুণ্ণ বোধ করি নি। প্রগতি লেখক আন্দোলন সম্বন্ধেও এখানে লিখছি না। যদি একটু-আধটু উল্লেখ এসে পড়ে, তো সেটা হবে—কটোমটো ভাষায়—আপতিক। তা যাই হোক, আমার খটকা লাগল দেখে যে হিন্দী-সাহিত্য-পরিচিতি প্রভূত হওয়া সত্ত্বেও এবং সে-সাহিত্য যে

একেবারেই নিঃস্ব নয় তো ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও তিনি প্রথম লাইনেই লিখলেন : 'হিন্দী-সাহিত্যে ষোড়শ শতকের কবি তুলসীদাসের পরে স্মরণীয় লেখক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫)...।' অবশ্য গুরুতর নালিশ আনছি না, কারণ এটা তো লেখকের নিজস্ব অভিমত হতে পারে আর যশ্‌পাল ও মোটামুটি তাঁর সমসাময়িক কাহিনীকারদের নিয়েই তাঁর রচনা। তবে "মনে এলো" (এটা ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এক গ্রন্থেরই নাম) হিন্দী-উর্দু-হিন্দুস্থানী বিষয়ে কয়েকটা কথা যা অনেক বেশি জ্ঞানের ভিত্তিতে বিষ্ণুপদবাবু অন্তত একটু আলোচনা করলে বেশ হত। কয়েকটা "এলোমেলো" (কবি বিষ্ণু দে-র একটি পছন্দসই শব্দ) ভাবনা এখানে তাই হাজির করতে চাইছি।

স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে গান্ধীজী (এবং আরও অনেকে) হিন্দী আর উর্দুর ব্যবধান কমিয়ে নাগরী এবং ফারসি হরফে দুটি সহোদরা ভাষার দৌলত মিলিয়ে হিন্দুস্থানীর প্রচলন চেয়েছিলেন, গোটা দেশকে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে তা সহায় হত আশা করে। নানা কারণে এটা ঘটে নি। 'হিন্দী-হিন্দুস্থানী' আর 'উর্দু-হিন্দুস্থানী' বলে দুটি উদ্ভট শব্দের উদ্‌ভাবন হয়েছিল এবং অত্যন্ত অসঙ্গত হলেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই মতভেদ চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। কিছুতেই ভুলতে পারি না কাশীর "ভারতমাতা মন্দিরে" মূর্তির বদলে আছে ভারতবর্ষের মানচিত্র আর বিভিন্ন ভাষার লিপি খোদাই করা, কিন্তু শুধু অশোভন নয় বেদনাকর লেগেছিল, যে বিদেশাগত লিপির অজুহাতে উর্দু ভাষা সেখানে অদ্ভুত, যদিও 'হিন্দুমুসলমানের মিলিত সাধনা'-র (শব্দটি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ব্যবহার করে গিয়েছেন) এক সুন্দর, স্বাদু সুফল হল উর্দু-নামক একান্ত ভারতবর্ষীয় ভাষা। সহজে যে বিতর্ক মেটানো সম্ভব ছিল, তাকে জিইয়ে রেখে তুচ্ছ পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির দুষ্কর্মে ব্যবহার ঘটল, যার রেশ আজও মিলিয়ে যায় নি। সংস্কৃত-প্রধান হিন্দী ও ফারসিপ্রধান উর্দুর উৎপাতবৃদ্ধি দেখা গেল, স্বাধীন ভারতও সরকারি আনুকূল্য দিল প্রথমোক্তকে। অসঙ্গত অবান্তর অথচ নানা ঐতিহাসিক কারণে মনের অবচেতনে যে সংকীর্ণ তুচ্ছতা উৎপাটিত হয় নি, সেই সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পেতে থাকল, সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাই যে সাহিত্য-উৎকর্ষের মূল তা বিস্মৃত হয়ে কৃত্রিম শব্দ উদ্‌ভাবন ও প্রয়োগের প্রয়াস হতে থাকল পাল্লা দিয়ে। সংস্কৃত, আরবি, ফারসি প্রভৃতি 'ক্লাসিকাল' বলে পরিগণিত ভাষা যে একান্তভাবে মহার্ঘ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদেশের অধিকাংশ ভাষা (দক্ষিণভারত-সমেত) যে "সংস্কৃতের দুহিতা" (বাঙলা নিয়ে এটাই ছিল মাইকেল মধুসূদনের গর্ব), তাতে সংশয় নেই। তবুও দেশের কর্তৃপক্ষ যেন ভুলে গেল 'ভারতপন্থ'-এর উদ্‌গাতা মহাত্মা কবির-এর কথা : "সংস্কৃত্‌ হুয়্‌ কূপজল্‌, ভাষা বহতা নীর্‌"! প্রগতি-লেখক-সংঘের শক্তি স্বল্প আর প্রভাব অকিঞ্চিৎকর বলে তার ক্ষীণ কণ্ঠ প্রায় স্তিমিত হয়ে গেল।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেরই প্রাঙ্গণে (১৯৩৬) প্রথম ভারতীয় প্রগতি-লেখক-সম্মেলন হয় স্বনামধন্য মুন্সী প্রেমচন্দ-এর নেতৃত্বে। সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে বোধহয় একা আমি জীবিত রয়েছি, (বেশ মনে পড়ে, সেখানে উপস্থাপিত করি বাঙলার পক্ষ থেকে আমার অবিস্মরণীয় বন্ধু ও সহযোগী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মহার্ঘ প্রবন্ধ)। দলবেঁধে সাহিত্য-আন্দোলনে সায় দিতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র যে বাণী দেন, তা নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানে ছিলেন সরোজিনী নাইডু মওলানা হসরত মোহানির মতো মহাভাগ। ছিলেন সুমিত্রানন্দন পন্ত আর ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ। দেশ-সেবার অপরাধে তখনও কারারুদ্ধ না হলে থাকতেন যশ্‌পাল। থাক সে-কথা, শুধু মনে রাখব যে প্রেমচন্দ-এর মতো প্রতিভাকে হিন্দী বা উর্দু লেখক বলে ভাবা যায় না—দুই ভাষার গঠন ও চরিত্র নিয়ে ফারাক থাকলেও অচ্ছেদ্য তাদের সম্পর্ক আর এখানেই তাদের বৈভব, তাদের দৌলত, তাদের দীপ্তি, তাদের প্রাণ-শক্তি।

একেবারে কি এলোমেলো বলে কেউ বাতিল করবেন, এই প্রসঙ্গে আমার মনে আসা প্রায় সাতশো বছর আগের বহিরাগত এক বিরাট পুরুষের কথা? তিনি হলেন আমার এক প্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্র—খিলজি বংশের রাজ-সভাকবি হয়েও যিনি লিখেছিলেন: 'বঞ্চিত দরিদ্রের অশ্রুজল জমাট হয়ে হয়েছে মুক্তো যা শোভা পায় ধনীর কণ্ঠে', সেই আমির খসরু। এদেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন : 'আমি তুর্ক নই, আমি ভারতীয়, 'হিন্দ্‌ভি'। এদেশ যে গরম তার কারণ হল সূর্য একে ভালোবাসে; এখানকার ফুল গন্ধে ভরা, সঙ্গে-সঙ্গে কত তার রঙ আর শোভা; আর এদেশের প্রাণ, তার তুলনা কোথায়?' সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা আর সেযুগের পক্ষে সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম এই মহাপ্রতিভাধর মানুষটিকে হিন্দী ভাষার এক প্রধান স্রষ্টা বলা ভুল নয়।

আমির খসরু থেকে আবুল ফজল-এর মধ্যবর্তী যুগে স্পষ্ট হল যে হিন্দু মুসলমান এই দ্বি-ধারা ভিন্ন হয়ে থাকতে পারে না। কেবল যে মুসলমান ও হিন্দু মিলে উর্দু-ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটাল, তা নয়। বাঙলা কিংবা মারাঠি ভাষায় মুসলমানের অবদান অসামান্য (হয়তো বলা চলে যে আজও মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশে মাতৃভাষার প্রতি মমতা এরই জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য)। ক'জন আমরা মনে রাখি যে যেমন চণ্ডীদাস লেখেন : 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই', তেমনই কাজী দৌলত-এর মুখে শুনি : 'নর সে পরম দেব, নর সে ঈশ্বর / নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর'? ক'জনের মনে আসে, মহাত্মা তুলসীদাসেরই সমসাময়িক বিরাট লেখক মালিক মুহম্মদ জৈসি-র "পদ্মাবত"-এর কথা, যাকে অবলম্বন করে বাঙালি মহাকবি আলাওল লেখেন "পদ্মাবতী" (রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে ও অন্যান্য বহু বিষয়ে লিখতেও আলাওল-এর আটকায় নি)। জৈসি হিন্দীতে রাজস্থানকাহিনী থেকে যে কাব্য লিখলেন তা তুলসীদাসেরও অনতিপূর্বে, আর তার গুণাবলীর প্রশংসায় হাজারিপ্রসাদ ত্রিবেদীর মতো হিন্দী-সাহিত্য-বিষয়ে বিদ্বান ছিলেন শতমুখ। হিন্দীর বিকাশে কী বিপুল ভূমিকা রয়েছে আমির খসরু থেকে আকবর বাদশাহের সভাসদ আবদুর রহমান খান খানান্‌-এর!

বাবা ফরীদ-এর মতো মুসলিম সাধুকে বলা যায় পানজাবি-ভাষার (এবং সিন্ধীরও) জনক। ঐ দুই ভাষার সর্বমান্য স্রষ্টা ছিলেন আর-এক সাধু—শাহ্‌ আবদুল লতীফ (১৬৮০-১৭৪৮)। ভাষাভেদবুদ্ধি যখন প্রকট নয়, তখন আলী হায়দর এবং তার চেয়ে বিখ্যাত ওয়ারিস শাহ্‌-এর নামাঙ্কিত "হীর-রঞ্ঝা"-র মতো প্রেমগাথা উত্তর ভারতের হৃদয় জয় করে রয়েছে, হিন্দু-মুসলিম তফাত সেখানে নেই। এরই সঙ্গে ভাবি "মহাসমুদ্রের সম্মেলন" আখ্যা দিয়ে দারা শিকোহ্‌-এর সর্বশাস্ত্র-মন্থন, "সত্যস্য সত্যম্‌" বলে ঘোষিত উপনিষদের প্রচার। বিশ্বের ইতিহাসে এই মুঘল যুবরাজ অনন্য; তাঁর মৃত্যুতে মথিত হয়েছিলেন বাঙালি-কবি "দ্বিজ রাম" (দীনেশচন্দ্র সেন-এর মতে রামপ্রসাদ সেন)। পুণ্যভূমি বলে ঘোষিত এই ভারতভূমিতে মুসলমান পরবাসী হয়ে থাকে নি। ইংরেজের মতো সে উড়ে এসে শিকার সংগ্রহ করে চলে যাওয়ার জন্য আসে নি। কী অনবদ্য লাগে বাবা ফরীদ-এর কবিতা : 'ফরীদ, এ-মাটিকে হেলা কোরো না / কোথায় এর তুলনা? জীবৎকালে আমাদের বিচরণ এর উপর / আর যখন মরব, তখন এর নীচেই নেব আশ্রয়!'

আমাদের ইতিহাসে দুষ্কৃতি ও স্খলনের অভাব নেই, কিন্তু গর্ব তো করবই, যে এদেশে কখনও ব্যাপক নির্মম বহু শতাব্দীব্যাপী ধর্মযুদ্ধ হয় নি। ধর্ম নিয়ে হানাহানি অবশ্য হয়েছে। বাঙালি বাউল মদন-এর খেদ কি জানি না আমরা—'ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায় / তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়?' 'গুরু আর মোরশেদ'-এর

কল্যাণে—'অভেদ-সাধন মরল ভেদে ?' মদনের এই দুঃখ তো আমাদের সকলেরই। নিয়মিত নামাজ না করে গান গেয়ে বেড়ায় এই নালিশের কী অপরূপ জবাব ছিল মদনের : 'কোনো ফুলের নামাজ রং-মশালে / কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে / বীণার নামাজ তারে-তারে / আমার নামাজ কণ্ঠে গাই !' আমার মতো নাস্তিক আর বস্তুবাদী আর 'প্রগতি-ওয়ালা'র কলম থেকে এসব বাক্য দেখে কেউ অবাক হলে নাচার। এদেশের সর্বত্র সাধুসন্ত, সুফী-দরবেশ প্রভৃতি যুগ যুগ ধরে মনুষ্য-মহিমা ও মৈত্রীর বাণী বহন করেছেন। দক্ষিণ-ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব সাধুরা, মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর থেকে তুকারাম, পূর্ব-ভারতে শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেব-এর মতো মানুষ, গুজরাতে মীরাবাঈ, উত্তরে নানকদেব থেকে রামানন্দ আর মনীষী রামানন্দেরই বহু শিষ্য-প্রশিষ্য। যাদের মধ্যে একজন মহিলা, একজন নাপিত, একজন মুসলমান জোলা। কে না জানে হিন্দু মুসলমানের কাছে সমান-ভাবে পূজ্য, অপরূপ কাব্যরসসিক্ত 'দোহা'-র স্রষ্টা কবিরকে, যিনি বললেন : 'হিন্দুকো হিন্দ্‌বাই দেখি / তুর্কন্‌কো তুর্কাই।' যিনি ধিক্কার দিলেন 'ধর্ম-বাণিজ্যক'দের আর প্রচার করলেন "ভারতপন্থ্"। কবির আর সুরদাস-এর মতো স্রষ্টা তো এদেশ আর ভাষার শিরোভূষণ।

সে-যুগের 'ভক্তি' আন্দোলনকে হেয় করা অজ্ঞান ও দুর্মতির লক্ষণ। পূর্বোক্তদের ছাড়া রবিদাস, দাদু দয়াল, বারভান, রজ্জব দাস প্রভৃতির সঙ্গে স্মরণ করা চাই মৈনুদ্দীন চিস্তি, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, শাহ্‌ জালাল, শাহ্‌ কলন্দর, বাহাউদ্দীন জ্যাকারিয়া প্রমুখ মহাপুরুষকে। এরা জনজীবনে প্রোথিত যে আলোড়নের প্রতিভূ, তা ইয়োরোপে অনুরূপ ঘটনার স্বরূপ উপলব্ধিতে সহায়ক হবে। মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌-এর রচনায় ষোড়শ শতকে মার্টিন লুথার-বিষয়ে আলোচনা আছে। বিদ্রোহী কৃষক জনতার বৈরী হয়েও লুথার নিজস্ব ধর্মীয় ভঙ্গিতে ছিলেন বিদ্রোহী। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্যন্ত তুলনায় অগ্রসর ইয়োরোপেও জন-অভ্যুদয় প্রকাশ পেত ধর্মীয় আন্দোলনের পরিচ্ছেদে। লুথার-রচিত গাথা "A sure stronghold our God is still"-কে মার্কস্‌-এঙ্গেলস্‌ বলেছেন "the Marseillaise of the 16th century" (বলা বাহুল্য 'মার্সেইয়েজ' হল ফরাসি বিপ্লবের দৃপ্ত জয়গান আর তা আজও ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত বলে স্বীকৃত)।

বাক্‌বাহুল্য ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু অন্তত আজ এ-দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য নিয়ে চিন্তা যদি আচ্ছন্ন না করে তো কবে করবে? দেশের সংহতি ও স্বভাবকে নষ্ট করার যে প্রচণ্ড প্রয়াস আমাদের বিপন্ন করে রেখেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এটা কি অবশ্যকর্তব্য নয় যে বহুকাল ধরে অশনে বসনে, আদব-কায়দায়, শাসনপদ্ধতিতে, ধর্মচিন্তায়, শিল্পকর্মে, সাহিত্য-সৃষ্টিতে একত্র জীবনযাপনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মাঝে-মাঝে কটু ও কঠোর স্বাতন্ত্র্যচিন্তার শিকার হয়েও যে-সহ-অবস্থানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে, তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার মতো নির্বুদ্ধি ও বিপথচারিতা বর্জনের সংকল্পে আমরা স্থির থাকব? আমাদেরই পরম্পরায় দেশের মানুষের মিলনের যে বুনিয়াদ রয়েছে তাকে অবজ্ঞা কেন করব? মার্কসই বলেছেন যে তত্ত্ব যখন জন-মানসকে উদ্‌বুদ্ধ করে, তখন তত্ত্বই এক বাস্তব শক্তি। আমাদেরই ঐতিহ্য থেকে সঙ্গতি সংগ্রহ করেই তো আমরা পারব পরিবর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে এগিয়ে চলার কাজে।

যশ্‌পাল আর হিন্দী-উর্দু ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক কথারই অবতারণা করে ফেলেছি। এটা ঘটল কারণ যশ্‌পাল-বিষয়ক প্রবন্ধটি পুরোনো বহু ব্যাপার মনে পড়িয়ে দিল, প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রায়-বিস্মৃত ইতিবৃত্তও জেগে উঠল। দেশেরই স্বার্থে সেই আন্দোলনের প্রকৃত ভূমিকা ও মর্যাদা নিয়ে সুস্থ শুভানুধ্যায়ী চিন্তার প্রয়াস যেন ঘটে।

বহু জনের সঙ্গে বিচরণ বিনা 'সাহিত্য' সম্ভব নয়;

'সহিত' শব্দেই তা সূচিত। নটরাজ শিব ভক্ত-কল্পনায় একক নৃত্য করতে পারেন, কিন্তু বিবিধ কণ্ঠধ্বনি ও চরণক্ষেপের সহর্ষ ও পরস্পর-সম্মতিতে পরিশীলিত সামঞ্জস্য বিনা মানুষের নৃত্য অচিন্তনীয়। সংগীতের নভোবিহারী মহিমা এই সীমিত মর-জগতের রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ বিনা আহৃত হয় না। কণ্ঠে বা যন্ত্রে উভয়ের সমাবেশ বিনা তা আধৃত হয় না। এই মাটির পৃথিবীতেই শিল্পের গতিবিধি, রক্তমাংসের মানুষ তার স্রষ্টা তার ভোক্তা। তাই অনুভূতিকে যদি আকাশের গ্রহ-তারা ও সূর্যরশ্মিকে স্পর্শ করতে হয়, তো মাটিতে তার শিকড় না থাকলেও চলে না। কত-কাল আগে গ্রীক ঋষি হেরাক্লিটস বলেছিলেন : 'মানুষ যখন নিদ্রামগ্ন, তখনই প্রায় এককভাবে সে স্বপ্ন দেখে; তখন তার শয্যায় সে স্বতন্ত্র। কিন্তু মানুষ সৃষ্টিশীল তখনই যখন সে জাগ্রত, বহুজনের মধ্যে অবস্থিত।' রবীন্দ্রনাথ ঈপ্সিত বিশ্বসত্তার সঙ্গে 'যোগ' খুঁজে পেয়ে-ছিলেন—'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো।' 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট' যে-সত্য তারই সন্ধানে কবির 'হৃদয়-সাগর-উপকূল' সতত "আকুল" হয়ে উঠত। "La condition humaine" শিল্পস্রষ্টার কাছে অবান্তর হওয়া অসম্ভব। এজন্যই সভ্যতার প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদে রয়েছে : 'মিত্রবর্যাঃ। মিত্রস্য যা চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্ / মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি সমীক্ষে' ('হে বন্ধুরা, বন্ধুর দৃষ্টি নিয়ে সর্বভূত এবং আমি পরস্পরের দিকে চাইতে পারি')। বেদে রয়েছে সর্বজনকে সম্বোধন করে শাশ্বত আহ্বান : 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসিজানতাম।'

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গুণী প্রগতি-লেখক-সংঘে যোগ দিলে তিরস্কৃত হয়েছিলেন : 'চিন্ময় বাস্তবের পরিবর্তে জড়-বাস্তবের উপাসনা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে, রূপকার কবির আসন হইতে রূপ-বিদ্রোহী কর্মকারের পদবীতে নামিয়া আসিয়াছেন।' স্বয়ং বিশ্বকর্মাই যে কর্মকার, তা এখানে বিস্মৃত। কিন্তু কে না মুগ্ধ হবে শিল্পীশিরোমণি পিকাসো-র আবিষ্কার দেখে, যে ছবি তার "হাতিয়ার"—কমিউনিসট পার্টিতে ঢুকে তিনি বলেছিলেন : 'চিরকাল আমি নির্বাসিত; আজ আমার নির্বাসন ঘুচল।'

এত কথা মনে আসছে কারণ বেশ কিছুকাল বেদনা বোধ করে চলেছি, চারদিকে তাকিয়ে প্রায় মূক হয়ে পড়ছি দেখে, যে সম্প্রতি 'শয়তানী গাথা' অ্যাখ্যা দিয়ে কাহিনী ফেঁদে সালমান রুশ্‌দির-র দুর্মতিতে ধিক্কার উচ্চারিত হল না সম্যকভাবে। আশ্চর্য হতে হল জেনে, যে, প্রগতিবাদী বলে পরিচিতদের মধ্যে সাড়া জাগল না, রব উঠল প্রধানত বাক-স্বাধীনতা নিয়ে আর ইরানের ইমাম খোমাইনি দ্বারা "পাপিষ্ঠ" লেখকের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার ফলে। রোষান্ধ মোল্লাতন্ত্র "blasphemous bastard" বলে অভিহিত করল রুশ্‌দিকে। অবশ্য "bastard" হওয়ার দায়িত্ব অপরের, আর "blasphemy" যদি ঘটে থাকে তো ধর্মাধিকরণে বিচার হতে পারে তো হোক্‌! একজন লেখকের শিরশ্ছেদের আদেশ ও সেজন্য বিপুল পুরস্কার ঘোষণা ধর্মের নামে অধর্ম, নিষ্ঠার নামে অমানবিক জিঘাংসারই হুঙ্কারজনক প্রকাশ যা বর্তমান জগৎ কখনও মানবে না। তাই একান্ত ও প্রচণ্ডভাবে বিচলিত আর ব্যথিত হলেও সমগ্র মুসলিম দুনিয়া ইরানের পুরোহিততন্ত্রের প্রতি-ক্রিয়াকে সমর্থন জানায় নি। এটা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত পশ্চিমী দুনিয়ার, যেখানে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতেই খুঁচিয়ে তোলা হচ্ছে শুধু ইসলাম নয়, গোটা প্রাচ্যের প্রতি বিরূপতা। খোমাইনির হুকুমে বছরের পর বছর ধরে হাজারে-হাজারে যখন শুধু কমিউনিসট নয় সব ধরনের মুক্তি ও গণতন্ত্রকামীকে হত্যা চলেছে নৃশংসভাবে, তখন যাদের টনক নড়ে না, তারাই 'বাক্‌স্বাধীনতা'-র মন্ত্র আউড়ে নিজেদের উৎকর্ষ প্রমাণ করতে চাইছে। নতুন এক 'crusade' আজ চলেছে, যা স্মরণ করিয়ে দেয় প্রথম মহাযুদ্ধ শেষে (১৯১৮) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ-এর

সদর্প-ঘোষণা যে—সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 'ক্রুসেড'-এ (ধর্মযুদ্ধ) ইয়োরোপ জিতেছে! তা যাই হোক্, আমি বিচলিত হয়েছি দেখে যে, সাহিত্য অকাদেমির আলোচনাতে মুলকরাজ আনন্দের মতো লেখক রশ্‌দি-বিষয়ে বাক্‌স্বাধীনতার প্রশ্নকে বড়ো করে ধরলেন, "শয়তানী গাথা"-র মতো রচনাকে ধিক্কার দিলেন না মন খুলে। কলকাতার সংবাদপত্রে দেখেছি যে, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর মতো সংবেদনশীল বিদ্বান্ ও সুলেখক আক্রান্ত হলেন খোমাইনির অপ-কীর্তির নিন্দার সঙ্গে-সঙ্গে রশ্‌দি যে মারাত্মক দুষ্কর্ম করে বসেছেন তার নিন্দা সুস্পষ্টভাবে করার জন্য। বাঙলা সংবাদপত্রে মাত্র কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান চিন্তাবিদের একটি বিবৃতি দেখে ভালো লেগেছে, কিন্তু লেখককুল রশ্‌দির দুষ্কর্মের ধিক্কারে গর্জিত হলেন না কেন?

ভারত সরকার রশ্‌দির বইটি এদেশে নিষিদ্ধ করায় স্পর্ধিত গ্রন্থকার খ্যাতির শিখর থেকে প্রধান-মন্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলেন। আমাদের এই উপ-মহাদেশের পরিস্থিতি তাঁর অজানা নয়। জগৎ-জুড়ে একশ কোটি মুসলমানের মর্মস্থলে নিদারুণ-আঘাতের কুফল কী হতে পারে তা জানার দায়িত্ব যেন তাঁর ছিল না! কোথা থেকে আসে এ-ধরনের অমানবিক দর্প, বিশেষ করে হৃদয়-সংবেদন ব্যাপারে সর্বজ্ঞ লেখকের বেলায়? যাই হোক্, রাজীব গান্ধীকে ক্ষমতার আসন থেকে অপসৃত দেখতে আমরা অনেকেই চাওয়া সত্ত্বেও "শয়তানী গাথা" নিষেধ যে সমুচিত তা বলতে কুণ্ঠা কেন? বহুবার বহু উপলক্ষে বক্তৃতা এবং লেখায় আমি রাজীবের প্রখর, কঠোর সমালোচনা করতে সঙ্কুচিত হই নি—এমনও প্রকাশ্যে একাধিকবার বলেছি যে, রাজীব যেন একটা বিড়ালের মতো টেবিলে উঠে পড়েছে কিন্তু কোন্ দিকে যে লাফ দিয়ে নামবে তা জানার উপায় নেই! তার রাজনৈতিক বিরোধিতা করি বলে রশ্‌দি-ব্যাপারেও তাঁকে সমর্থন জানাব না, আওয়াজ তুলব বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে শুধু? কোথায় কোন্ কালে কোন্ সমাজে চালু হয়েছে বা হতে পেরেছে একেবারে অবাধ 'স্বাধীনতা'? ভিড়ে ঠাসা থিয়েটার হলে ঢুকে "আগুন! আগুন!" বলে চিৎকারের অধিকার কি আছে নাগরিকের? এইচ. জি. ওয়েল্‌স্-এর মতো মনস্বীর "The Outline of History"-তে হজরত মুহম্মদ সম্বন্ধে কতকগুলো কটু মন্তব্য বহুদিন আগে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। সম্প্রতি কালে স্বয়ং রাধাকৃষ্ণন্-সম্পাদিত গান্ধীজী-বিষয় গ্রন্থে (যাতে আমারও লেখা ছিল) ইংরেজ চিন্তাবিদ্ আর্নল্ড্ টয়েন্‌বি-র মন্তব্য "স্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকায় প্রকাশের পর কলকাতায় দাঙ্গা, প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটেছিল। সালমান রশ্‌দির বই জগৎ-জুড়ে ছাপা হয়েছে, লক্ষ-লক্ষ লোক কিনছে, কিনবার জন্য ছোটাছুটি করছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে মুসলিম মানসিকতায় প্রচণ্ড আঘাত পড়ায় শুধু যে রশ্‌দিকে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে তা নয়, নানা দেশে শান্তিভঙ্গ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কী বিষম এই 'শিল্পীর স্বাধীনতা', যার দোহাই দিয়ে এমন কাণ্ড সম্ভব হয়!

শুনেছি বাম-ঘেঁষা বলে নাকি রশ্‌দির খ্যাতি। নিকারাগুয়া সম্বন্ধে তাঁর একটি পুস্তিকা পড়ে ভালোই লেগেছিল। ঔপন্যাসিক হিসাবে তার বিচারে অধিকারী আমি নই। কিন্তু বাম-দক্ষিণ-মধ্য, যেখানেই অবস্থান হোক্ না কেন, নিছক সহজ সাধারণ মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে বা বিস্মৃত হয়ে লেখক-মহিমা অর্জন কি সম্ভব? খোমাইনির রুদ্র-রোষ ঘোষিত হবার পর রশ্‌দি কি আত্মমর্যাদা বজায় রেখে অথচ স্পষ্টভাবে দুঃখ প্রকাশ করতে পারলেন না? বরঞ্চ যা লিখলেন তা যেন কাটা ঘায়ে নুন ছিটাবার মতো। এখনও ভরসা করব তার সুবুদ্ধি ঘটবে, মারণ-যজ্ঞে ঘি ছিটাবার মতো এই গ্রন্থটিকে স্বেচ্ছায় লোকচক্ষু থেকে সরিয়ে রাখা হবে। এখনও এর কোনো চিহ্ন নেই, বরং বাণিজ্যসাফল্যের আশায় লক্ষ লক্ষ কপি ছাপার কথাই উঠছে, যদিও রোমের পোপ থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত নানা কারণে বইটির নিন্দা করতে বাধ্য হয়েছেন। যথেষ্ট প্রচার তো ইতিমধ্যেই ঘটেছে; থাকুক্ না এখন গ্রন্থালয়ের সিন্দুকে।

আদি কবি বাল্মীকি ব্যাধের শর নিক্ষেপে মিথুন-রত ক্রৌঞ্চের নিধনে ব্যথিত হয়েছিলেন আর যা বলে-উঠেছিলেন তাই হল আমাদের প্রথম কবিতা। সব দেশেরই ইতিহাসে দেখব যাঁরা ঋষি, যাঁরা কবি, যাঁরা মনুষ্যমানসে পূর্ণতার সঞ্চার করতে পারেন, তাঁদের সত্তা হয় মধুনিষ্যন্দ; গৌতমবুদ্ধের সাধনফল যে করুণা তাঁরই বাণী বহন, বিকিরণ, প্রস্ফুটন প্রভৃতি কর্মের অধিকারী হলেন তাঁরা। এজন্যই শেলী-র মতো কবি বলতে পারেন যে, বিশ্বের বিধায়ক হল কবিকুল, তা স্বীকৃতি মিলুক বা না মিলুক। জানি এ-ধরনের কথা আজকের আবহাওয়ায় বাতিল, কিন্তু মানবমমতা আর সমাজদায়িত্ব অস্বীকৃত হলে সাহিত্যের সত্তা ও সার্থকতা কোথায়? হয়তো বিরক্তি উৎপাদন করছি কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল মাছরাইতে প্রস্তরে খোদিত রয়েছে একটি ছবি—'বরাহশৈলে'—শিকারী রাজার হাতে বরাহীর মৃত্যুর পর স্বয়ং শিব মাতার রূপ নিয়ে শিশু বরাহগুলিকে "স্তন্যামৃত" দিলেন; "করুণামূর্তি" তাই শিবেরই এক নাম। সালমান রশ্‌দির মতো উচ্চশির লেখকেরা কবে বুঝবেন রবীন্দ্রনাথের আহ্বান: 'জয় তব বিচিত্র আনন্দ হে কবি, জয় তোমার করুণা!' সৃষ্টি করেন যে কবি, তিনি করুণারস থেকে বঞ্চিত হলে তো রিক্ত, লঘু, ব্যর্থ।

সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সৃষ্টি, সংবেদন, শুভ-কর্মপথের আবাহন আজ যেন অবান্তর। তাই আসেন স্টীভন্ স্পেণ্ডর-এর মতো কবি, এখানে পান উল্লসিত অভ্যর্থনা, হয়তো একটু ক্লান্ত স্বরে বলেন কমিউনিজম জিনিসটা ভালো ছিল কিন্তু কেমন যেন পচে গিয়েছে, আর আমাদের মতো দেশের সর্বনাশী দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ উঠলে বলেন যে, গরিবের দুঃখমোচনে যদি মানুষের দৌলত যুগ-যুগ ধরে ব্যয় করা হত তো "সভ্যতা" বলে বস্তুর দেখা পেতাম না! বাক্‌স্বাধীনতা নিয়ে ওজস্বিতার বহর অবাক করতে চেয়েছে সবাইকে —কেবলই নাম হয়েছে মহামনস্বী ভল্‌তেয়র-এর, যিনি ইতিহাসে অবশ্যই নমস্য, কিন্তু বলতে কুণ্ঠিত হন্ নি যে জ্ঞানের প্রবোধন প্রয়াসে "মুচি আর ঝি-য়ের দল" ("Shoemakers and Servant Girls") জায়গা পায় না, তারা হল "সাধুসন্তদের দায়ভার" ("the portion of the apostles")! সাধে কি মাওৎ-সে-তুং বলেছিলেন: 'Never forget the class struggle!'

"শয়তানী গাথা" নিয়ে চাঞ্চল্য প্রশমিত হবে, উগ্রতা ফুরিয়ে যাবে, স্তব্ধ হবে, আর দেখব, 'স্রোত চলে, সূর্য জ্বলে।' সারা সংসারকে সুখী আর সুন্দর করে তোলার কাজে শেলী-কথিত "বিশ্বের বিধায়ক" ("legislators of the earth") তাদের অকাট্য কর্তব্যে এগিয়ে এসে অটল থাকবেন নাকি?

রাষ্ট্রযন্ত্র

মলয় রায়চৌধুরী

প্রথমে একটা ফুসকুড়ি হয়েছিল তারপর
দাঁতেকাটা ফলপোকার আলো কেয়ারি করা কুয়াশায়
শীতসাপের অনলস কুঁড়েমিতে আটক
তারা স্বপ্নের মানে বোঝে নি চেয়েছে পৃথিবীর চাকরি
ডিজেল ধোঁয়া-মাখা হেমন্তের আড়তে
ধুলোয় বুকঘষা ডাহুক আকাশের জমিদারি মুক্ত
যখন বোবাদের গলার শির ছিঁড়েছে
আত্মার নরমকোমলে যে ধাতব অপ্রিয়
বাতাসে খিলখিলিয়ে শায়াশেমিজ
পায়ের ছাপ নিয়ে ফিরেছে সবুজ ঢেউ
ঝাঁকেঝাঁক হাতে গড়া অন্ধকারে
কিশোর বিচারে কেষ্টকুচকুচে বুটুয়া
জিভের মিহিন বাজনায় দরাদরিতে পাওয়া পতন
শব্দের ভেতর শব্দে যতোটা মাখন
পুণ্যাত্মার অবধারিত ভোগান্তি যেন
দিনের ভেতর হিঁচড়েছে সকালকে
আর উড়ন্ত ধুলোয় ভুরুধূসর
বেরিয়েছে তাঁবুর অন্ধ বাসিন্দারা
ধাতু পঙ্গপালের আকাশে কাঁধে নেচেছে লাশমাচান
শরীর খারাপ হয়ে গেছে শিশুকান্নায়
শীত যে নক্ষত্রঘূর্ণি পুঁতে রেখেছিল
স্বর্গে-স্বর্গে ছেয়ে গেছে ছত্রাক
খেত-খুশ বাতাসে ফুলমাতাল পুঃফড়িং
কোরাসগানে ডানা উড়িয়ে কাকের জিভে ঠাশা হাঁ-মুখ
মরা সকালের পরাগমাখা ব্যথাকেন্দ্র

অপচয়

স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায়

অতিদূর দ্বীপের নাবিক ফিরে আসে
এপ্রিলের রমণীয় সন্ধ্যায়
বছরের সম্পদ সঞ্চিত ক'রে,—
দিগন্তে উদ্ভাসিত স্বপ্নলোকের কাছে
আজ তার প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাবে সে
উচ্ছ্বাসে, অন্তর্হিত দ্যোতনায়।

আমি অপলক একা চেয়ে থাকি—
বিরামবিহীন নীলজলে, সান্দ্র, সন্ধ্যাবিলাসী জোছনায়।
রাতের আকাশ দূরান্তের তারায়-তারায় জেগে ওঠে
তার প্রণয়সঞ্জাত প্রতিভায়—তারই প্রতিভাস
কূলে, অনিমেষ মুকুতা পাঁতিতে;
বীচের কাননে পাখি মেঘের পুঞ্জ থেকে উড়ে যায়।

চাঁদ জানে—
আমার স্খলিত লগন মালা গাঁথে
সময়ের সুরভিনিবিড় ফুলে নৈশ-নিস্বনে
শুধু, কোনো বাঙ্ময় একটি রাতের আশায়।

প্রেম-অপ্রেমের কবিতা

দাউদ হায়দার

১. হৃদয়পথে চলিতেছিল ব্যাকুল জটিলতা—
'মুখপানে চিহ্ন কোথা'? কহিল বনলতা
'নদীর জলে চাঁদ উঠিলে নদীর ক্ষতি কী-যে
নদী জানে? —চাঁদের মরণ জ্যোৎস্নাজলে ভিজে

'মুঠোর ভিতর চাঁদ ধরেছ কিসের অভিশাপে
নদীর ঢেউয়ে দু'পার ভাঙে, আকাশ কেন কাঁপে'?

ব্যাকুলতা যত না তার জটিলতাই বেশি
হৃদয়পথে আঁধার ঘন, বাহিরপানে কে সে।

(বার্লিন, পশ্চিম জার্মানি / নভেম্বর ১৯৮৮)

২. 'আনন্দরূপের বিভা'
নাকি, অনার্য প্রতিভা

দেশে ঠিকানা কুরুক্ষেত্র?
দু'চোখ বন্ধ করে বলেছ "নেত্র
অসুখে ভুগছে, নানা অত্যাচারে
বাঁচি-মরি বাংলার সংসারে"

রূপের নম্র বিভাসে
ঘৃণার জীবন রচি শ্বেতাঙ্গ-প্রবাসে

(গোটিংগেন, পশ্চিম জার্মানি / অকটোবর ১৯৮৮)

দহন

আনন্দ ঘোষ হাজরা

তার চারদিকে বৃত্তের পরিধিটা দেখতে-দেখতে যখন সে
ক্লান্ত এবং হতাশ, তখনই বৃত্তটি থেকে জন্ম নিলো নতুন
বৃত্ত।···এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ···নতুন বৃত্তের
পরিধিগুলোও তাকে ঘিরে ধরলো। তারপর সব বৃত্তগুলি
সঙ্কুচিত হতে-হতে সঙ্কুচিত হতে-হতে, তাকে বেড়ির মতো
জড়িয়ে চাপ দিতে থাকলো। ঠিক সেই সময়েই আকাশে
কালো মেঘ, ঝড় এবং বিদ্যুৎ। পরিণামে পরিধিগুলি
তড়িৎবাহী। বিদ্যুতের আঘাতে-আঘাতে তার সমস্ত
শরীর কেঁপে-কেঁপে নীল। তখনই হলো বজ্রপাত।
জ্ব'লে উঠলো পরিধিরা। জ্বলতে লাগলো তার
শরীর, মন এবং সমগ্র। জ্বলতে-জ্বলতে, জ্বলতে
জ্বলতে, সে একসময় পুড়ে ছাই। এখন ছাইগুলোকে
উড়িয়ে দিচ্ছে বাতাস···স্নিগ্ধ বাতাস···

রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম এবং এদেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলন

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'পোলিটিকাল আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার স্বধর্মবিরুদ্ধ।' যদিও পলিটিকাল আন্দোলনে তিনি যে একেবারে যোগ দেন নি, তা বলা যায় না। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাই নয়; গানে মিছিলে ভাষণে তিনি আন্দোলনকে লালন করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন ছাড়াও তাঁকে পলিটিকাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে, তবে সেখানে নেতারূপে নয়, সমালোচক বা প্রতিবাদী বিবেকরূপে। জীবনে পঁচাত্তর বছর পার করে পলিটিকাল আন্দোলন তাঁর 'স্বধর্মবিরুদ্ধ' এই প্রত্যয় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার পরেও রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক তিনি সম্পূর্ণত ছিন্ন করতে পারেন নি, ১৯৩৯ সালে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের মঞ্চে গান্ধী-সুভাষ সংকটের সময়েও তিনি নীরব থাকতে পারেন নি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদানে যে প্রত্যাশা তাঁর মনে জেগেছিল, তাও তিনি গোপন রাখেন নি। কিন্তু রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ধারা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেই চেয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে হিজলী বন্দি-শিবিরে নৃশংস ঘটনাবলীর প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে যে সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল, বিপুল জনসমাগমের কারণে সেই সভা শেষ পর্যন্ত অক্‌টার-লোনি মনুমেন্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় সভাপতিত্ব করতে এসে লিখিত ভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে।' তবুও সেদিন তাঁকে সভায় এসে দাঁড়াতে হয়েছিল, 'যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে। রক্ষকনামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতা-দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে'। যদিও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, 'কর্তৃপক্ষদের কৃত কোনো অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে

আমি বিশেষ আনন্দ পাই নে।' তবু 'এই সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশীল হোক-না কেন আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ।' সেদিনকার জন-সমাবেশে তাঁর এই উক্তি থেকে একটা ধারণা পাওয়া যায় যে তিনি রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কী ধরনের ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন।

যে-কোনো কালের বা দেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সূচনাপর্বে একদিকে বঞ্চনা, অপরদিকে সংগঠন-অর্থাৎ গড়ে তোলা যে-কোনো রকমের বঞ্চনার বিরুদ্ধেই গড়ে ওঠে আন্দোলন। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার, মানবিক অধিকার, স্বাধীনতা, ন্যূনতম আর্থিক বা সামাজিক সুযোগ-সুবিধা—এর যে-কোনোটির বঞ্চনাই রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কারণ। কিন্তু বঞ্চনা থাকলেই রাষ্ট্রিক আন্দোলন আপনি-আপনি গড়ে উঠবে—তা হয় না। ক্ষমতার ভিত্তিতে সমাজ সংগঠন গড়ে ওঠার পর থেকেই বঞ্চনা মানুষের নিত্যসহচর। কিন্তু বঞ্চনা যে মানুষের নিয়তি নয়, এ-বোধ আসে যখন মানুষের চিত্তে আত্মমর্যাদাবোধের উদ্‌বোধন ঘটে। সেই আত্ম-মর্যাদাবোধ মানুষের মনে জাগে, যখন মানুষ তার আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়—এটা আমার প্রাপ্য বা অধিকার, আমার মানবিক সম্ভাবনা বঞ্চনার ফলে বিকশিত হয়ে উঠতে পারছে না—এই বোধই রাষ্ট্রিক আন্দোলনে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করে। আত্মশক্তির চেতনা নেই, কেবল অধিকতর সুখকর জীবনধারণের লোভজনিত উত্তেজনা আছে—তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ডাক ব্যর্থ হতে বাধ্য। ১৮৪৮ সালে মার্কস্-এঙ্গেল্‌স রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেসটো পৃথিবীর মেহনতি মানুষের আত্মশক্তি-চেতনার গীতা-স্বরূপ। এরই ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশে-দেশে সাম্য-বাদী আন্দোলন ও বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। আবার যে অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখা হয় সে অধিকার অর্জনের সংগ্রামে যখনই আত্মদুর্বলতা দেখা দেয়, তখনই আত্মশক্তি-অচেতন আন্দোলনকারীর মনে ক্রোধের উত্তাপ বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রিক আন্দোলনে ক্রোধের উত্তাপ আন্দোলনকারীর দুর্বলতার লক্ষণ। এবং ক্রোধই শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকে বিপথে পরি-চালিত করে। স্বদেশী-আন্দোলনে বা গান্ধী-আন্দোলনে বিলিতি কাপড় বর্জন বা বহ্ন্যুৎসবে সেই ক্রোধই ছিল প্রধান পুরোহিত—না ছিল অর্থনীতির স্পষ্ট ধারণা, না ছিল স্বদেশী বস্তুর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবোধ। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে সন্দীপ নিখিলেশ আর তাদের মাঝে অমূল্য। সন্দীপের 'মুখে ত্যাগের ভান ও অন্তরে ভোগের ইচ্ছা', এমন বিপ্লবী চরিত্র বাস্তবে বাঙলায় জন্মায় নি হয়তো, তবে সে যে-উত্তেজনা ছড়াতে ওস্তাদ, তেমন হঠকারী নেতা দুর্লভ ছিল না। অপর দিকে অমূল্যের মতো কিশোর বিপ্লবী চরিত্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তরের টান কোথাও অপ্রকট থাকে নি। যদিও তাঁর সমর্থন ছিল নিখিলেশের সংযত ধীশক্তির প্রতি, যে বিলিতি কাপড়ের বহ্ন্যুৎসবে সায় দেয় নি। আর বিমলা যেন নিরীহ-নিষ্পাপ অথচ দ্বিধাজড়িত বিভ্রান্ত এদেশীয় জনমানস। ক্রোধে যত হুংকারের তীব্রতা এবং গর্জনের আতিশয্য থাকে, থাকে না ততখানি দৃষ্টি বা চিন্তার স্বচ্ছতা। ক্রোধ বা ঘৃণা যতই শারীরিক স্তরে নেমে আসে রাষ্ট্রিক আন্দোলন ততই পাশবিক রূপ নেয়। রবীন্দ্রনাথ এই স্তরের রাষ্ট্রিক আন্দোলন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। আন্দোলন অহিংস, না সহিংস—এ প্রশ্ন তাঁর সামনে বড়ো হয়ে দেখা দেয় নি। আন্দোলন অহিংসই হোক, আর সহিংসই হোক, প্রতিপক্ষে যে হিংসাশ্রয় থাকবেই তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়েই পরাক্রমশীল বিদেশীরাজের নরঘাতক নিষ্ঠুরতায় যে আত্মসম্মানহানি ঘটেছে তার প্রতি তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। হিজলী বন্দি-শিবিরের পাশবিক হত্যা-কাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষকে অভিসম্পাত

দিয়ে বিভ্রান্তিকর উত্তেজনার উত্তাপ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নি। তিনি বিদেশীরাজের দুষ্কর্মের তালিকায় আরেকটি অপরাধ জমা করে উত্তেজনার উত্তাপ বৃদ্ধিতে আনন্দ পান নি। বরং রাতের অন্ধকারে বন্দি-শিবিরে নিরস্ত্র বন্দীকে গোপনে হত্যার মধ্যে যে রাজপুরুষের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে, গোপন হত্যা যে প্রবল প্রতিপক্ষের আত্মসম্মানহানিকর দুষ্কর্ম তা সংযত বিশ্লেষণে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অপর দিকে বঞ্চিত মানুষ যদি অন্তরে দুর্বল হয়, যদি আত্মশক্তি, আত্মসম্ভাবনা এবং আত্ম-অধিকার সম্বন্ধে সে সচেতন না থাকে, তাহলে তার বঞ্চনাবোধের উত্তেজনা তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলবে। সে ক্রোধের আগুনে পাশবিক কোনো শক্তির সূত্রে রাষ্ট্রিক অধিকার যদিবা আয়ত্তে আসে, তা রক্ষা পাবে না আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের অভাবে। ১৯২১ সালে যখন দেশের রাষ্ট্রনেতা বলেছেন, বিদেশী রাজপুরুষের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতার পথে স্বরাজ করায়ত্ত হবে, তখন রবীন্দ্রনাথ সাবধান করে দিয়েছেন, 'ভারতে ইংরেজের আবির্ভাব-নামক ব্যাপারটি বহুরূপী, আজ সে ইংরেজের মূর্তিতে, কাল সে অন্য বিদেশীর মূর্তিতে এবং তার পরদিন সে নিজের দেশী লোকের মূর্তিতে নিদারুণ হয়ে দেখা দেবে। এই পরতন্ত্রতাকে ধনুর্বাণ হাতে বাইরে থেকে তাড়া করলে সে আপনার খোলস বদলাতে-বদলাতে আমাদের হয়রান করে তুলবে।' খোলস বদলানোর খেলা যে কী বিচিত্র রূপ নিতে পারে, তার পরিচয় ভারতবর্ষের মানুষ প্রত্যক্ষ করছে দেশের স্বাধীনতার পরবর্তী পর্বে, আর রবীন্দ্রনাথের বোধে তা স্পষ্ট হয়েছিল স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের এক বিশেষ মুহূর্তে, যখন দেশের এক বৃহৎ জনসংখ্যা রাষ্ট্রনেতার পিছনে সার বেঁধেছিল আশু স্বরাজপ্রাপ্তির সহজ প্রত্যাশায় এবং স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্র-আন্দোলনের সেই উন্মত্ত উত্তেজনার মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সংযম-শীতল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নন্দিত হয় নি পেশাদারি রাষ্ট্রনৈতিক মঞ্চে। অসহযোগ-আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলেও চরকার চক্র-চালনা নিয়ে যখন বিপুল উৎসাহ, তখন কেবল পেশাদারি রাষ্ট্রনীতিবিদ্ নন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো মানুষও রবীন্দ্রনাথকে লাঞ্ছিত করতে ছাড়েন নি। 'চরকা-চালনায় উৎসাহ প্রকাশ করি নি, অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাকে ছাপার কালীতে লাঞ্ছিত করেছেন। কিন্তু দণ্ড দেবার বেলাতেও আমার 'পরে সম্পূর্ণ নির্মম হতে পারেন না বলেই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকেও আমার সঙ্গে এক কলঙ্কের রসায়নের মিল করিয়েছেন।' তথাপি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত পালটান নি, 'কবুল করতে লজ্জা হচ্ছে না (যদিও লোকভয় যথেষ্ট আছে) যে, এ পর্যন্ত চরকার আন্দোলনে আমার মন ভিতর থেকে দোল খায় নি। অনেকে সেটাকে আমার স্পর্ধা বলে মনে করবেন, বিশেষ রাগ করবেন, কেননা বেড়াজালে যখন অনেক মাছ পড়ে, তখন যে মাছটা ফস্‌কে যায় তাকে গাল না পাড়লে মন খোলসা হয় না।' তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধারণা থেকে সরে আসেন নি, 'ছেলেভোলানো ছড়ায় বাঙালদেশে শিশুদেরই লোভ দেখানো হয় যে, হাত ঘুরোলে লাড়ু পাবার আশা আছে। কিন্তু, কেবল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত চালানোর দ্বারা মনের নিশ্চলতার অভাব পূর্ণ হয়ে দৈন্য দূর হবে, স্বরাজ মিলবে, এমন কথা বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বলা চলে না। ...এমন দেশে দেশ-উদ্ধারের নাম করে এল চরকা। ঘরে বসে-বসে চরকা ঘোরাচ্ছি আর মনে মনে বলছি, স্বরাজ-জগন্নাথের রথ এগিয়ে চলছে। ...কিছুতেই কিছু হল না, শুধু কি স্বরাজতীর্থের সাধন-মন্দিরে একমাত্র চরকা-দেবীর কাছেই সকলের অর্ঘ্য এসে মিলবে? মানবধর্মের প্রতি এত অবিশ্বাস? দেশের লোকের 'পরে অত অশ্রদ্ধা?'

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে জীবকুলে মানুষেরই আছে বঞ্চনাবোধ, যা পশুকুলে নেই। কারণ পশুকুলে আত্মশক্তি, আত্ম-অধিকার বা আত্মসম্ভাবনার বোধ অকল্পনীয়। মানুষের আত্মশক্তির উপর অগাধ আস্থাই তাকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সেই মানুষ যদি আপন দুর্বলতায়

ক্রোধ, ঘৃণা এবং উত্তেজনা সম্বল করে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে কেবলই হুঙ্কার, হিংসা আর হত্যায় না মিয়ে নিয়ে আসে, তবে মানুষে আর পশুতে পার্থক্য যায় ঘুচে। ফলে যে সংগ্রামের লক্ষ্য মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, সে সংগ্রামে হয়ে ওঠে কুটিল ষড়যন্ত্রমূলক। এ দেশের সহিংস বা অহিংস উভয় আন্দোলনই ছিল হয় রোমান্টিকতার রাংতামোড়া, নয় আবেগের উত্তাপোত্তপ্তিকর। এবং তার ফলেই একটা যুক্তিহীন আকর্ষণ মানুষকে টেনেছে উভয় আন্দোলনে। আবার যে জনসংখ্যা উভয় আন্দোলনের বাইরে থেকেছে, তাদেরও অনেকে স্বার্থনিমগ্ন আত্মোন্নয়নের নিশ্চয়তার মোহ ভাঙতে পারে নি। ফলে দেশ প্রস্তুত হয় নি কোনো দিক দিয়েই। রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্রোধ এবং ঘৃণা যেমন ছিল পরিত্যাজ্য, রোমান্টিকতা আর আবেগও ছিল তেমনি নিরর্থক। রোমান্টিকতার পিছনে থাকে এক উদ্যোগহীন সহজপ্রাপ্তির লোভী প্রত্যাশা আর আবেগের পিছনে সংযত নিষ্ঠার অভাব। ক্রোধ এবং রোমান্টিকতা, ঘৃণা এবং আবেগ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ—এই বোধ রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞায় ছিল স্পষ্ট। তাই প্রচলিত রাষ্ট্রিক আন্দোলন ছিল তাঁর স্বধর্মবিরুদ্ধ।

আরেকটি কথা, এই আবেগ ও ঘৃণার পিছনে আর একটি উপসর্গ আছে, এ-দেশে তাকে বাদ দিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ হবার নয়। সে হল এ দেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের যোগ। 'সমাজে ধর্মে ভাষায় আচারে আমাদের বিভাগের অন্ত নেই। এই বিদীর্ণতা আমাদের রাষ্ট্রিক সম্পূর্ণতার বিরোধী।... মানুষে মানুষে কাছাকাছি বাস করে, তবু কিছুতে মনের মিল হয় না, কাজের যোগ থাকে না, প্রত্যেক পদে মারামারি কাটাকাটি বেঁধে যায়—এটা বর্বরতার লক্ষণ।' ধর্মের ভিত্তিতে বিভাগ ও বিরোধের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটি-বিচারটা থাক্—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি, তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি।' এখানেই তিনি থামেন নি। 'ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল, আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ।' রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে, 'হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল।...আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান।' অথচ এ-দেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলন—তা সহিংস বা অহিংস যে-পথেই পরিচালিত হোক-না কেন, তার সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসের এক স্বাভাবিক যোগ ছিল—গুপ্ত সহিংস আন্দোলন বা গান্ধী আন্দোলন তো বটেই, সন্ন্যাসী, ওয়াহাবি, ফরাজি, মোপলা প্রভৃতি অনেক আন্দোলনই ধর্মসম্পৃক্ত। ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়—কৃষক বিদ্রোহগুলি এবং পরবর্তী কালে সাম্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন। তবে সে স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রিক আন্দোলনকে অন্বিত করার পিছনেও ছিল সেই আবেগের প্ররোচনা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আবার ঘৃণার উদ্রেক। আবেগ-বিবিক্ত রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কথা রাষ্ট্রনেতাদের মনে স্থান পায় নি বলেই ধর্মের দোহাই সহজেই এসেছে। আনন্দমঠের ভবানী মন্দির বোধহয় এই ভাবনার আদি প্রভাব। গুপ্ত সহিংস আন্দোলনে গীতা, তন্ত্র এবং কালী-আদ্যশক্তির মা গান্ধী আন্দোলনের বৈষ্ণবীয় অহিংসা বা রামরাজ্যের স্বপ্ন—সর্বত্রই ধর্মের তরল আবেগ ধর্মভীরু ভারতবাসীর একটি অংশকে সহজেই আপ্লুত করেছে এবং একই সঙ্গে অপর একটি অংশকে ধর্মের আবেগেই ঘৃণাশ্রয়ে দূরে থাকতে প্ররোচিত করেছে। এবং ক্রমে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে সমাজ জীবনেও। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ সাল বলছেন,

'যে-দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ।··· ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নবজীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্মবিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্বেকার ফরাসি-বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েরাত শিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর।' সোভিয়েত রাশিয়ায় যিনি বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই লেনিন এবং তাঁর পার্টি দেশের মেহনতি মানুষকে সংঘবদ্ধ করেছিলেন কেবলমাত্র অসংযত আবেগের বন্যার উচ্ছ্বাসে নয়। তাঁর বিপ্লবী-নেতৃত্বের পিছনে ছিল এক নতুন সমাজব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিশ্লেষিত প্রত্যয়। আজও দেখা যায় বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীরা অধিকতর তত্ত্বনির্ভর বলে আবেগবাদী জাতীয়তাবাদীরা তাঁদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনে উদ্যত। রাষ্ট্রিক আন্দোলন নিশ্চয়ই নিশ্ছিদ্রভাবে আবেগবর্জিত হবে না, কোনো দেশে তা হয়ও নি। স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি সেই আবেগ সঞ্চারেই সাহায্য করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু তারই পাশাপাশি তাঁর যুক্তিনির্ভর প্রবন্ধগুলির শাণিত বক্তব্য বা অন্যবিধ সাহিত্য-রচনায় সংযত সমালোচনা আন্দোলনকারীদের স্পর্শ করে নি, আবেগাপ্লুত পাঠকের মনে জাগিয়েছে নির্ভিত্তিক সন্দেহ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ আনে নতুন সমাজগঠনে আত্মশক্তির উদ্‌বোধন আর আবেগসর্বস্ব উত্তেজনা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, চিন্তাকে সংশয়ান্বিত করে, চিত্তকে সংকীর্ণ করে এবং সেই সুযোগেই ক্রোধ এসে সহজেই হঠকারিতার পথ দেয় খুলে।

রাষ্ট্রিক আন্দোলনের একদিকে যেমন বঞ্চনা, অপরদিকে তেমন সংগঠন বা গড়ে তোলা। সংগঠন বলতে দল বাঁধা নয়, দেশ গড়া। এদিকটিই সবচেয়ে অবহেলিত ছিল এ-দেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলনে। বঞ্চনাজনিত উত্তেজনাটাই সেখানে ছিল প্রধান ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রিয় কর্তব্য বলে মনে করি নে।···স্বরাজ হাতে পেলে আমরা স্বরাজের কাজ নির্বাহ করতে পারব, তার পরিচয় স্বরাজ পাবার আগেই দেওয়া চাই।···বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ পেলেই অন্তরের সেই জড়তা দূর হবে, একথা আমি বিশ্বাস করি নে।···যে মানুষ বলে, 'আগে ফাউন্টেন পেন পাব তারপরে মহাকাব্য লিখব', বুঝতে হবে তার লোভ ফাউন্টেন পেনের প্রতিই, মহাকাব্যের প্রতি নয়। যে দেশাত্মবোধী বলে, 'আগে স্বরাজ পেলে তারপরে স্বদেশের কাজ করব' তার লোভ পতাকা-ওড়ানো উর্দি-পরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার পরেই।···স্বরাজ আগে আসবে, স্বদেশের সাধনা তারপরে, এমন কথাও তেমনই সত্যহীন, এবং ভিত্তিহীন এমন স্বরাজ।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি স্বরাজ-প্রাপ্তির পূর্বে একভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল আর স্বরাজ বা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তী অধ্যায়ে 'পতাকা-ওড়ানো উর্দিপরা স্বরাজের রঙকরা কাঠামোটার' পরিচয় আজ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেদিনের উত্তেজনার পিছনে যে দূরবর্তী অনিশ্চিত লোভ ছিল, আজ তাই রাষ্ট্রিক আসরে নিত্যদিনের কৃত্য। এদেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের আদিপর্বে ছিল উপরওয়ালার কাছে আবেদন-নিবেদন, দেশের মানুষের সঙ্গে যোগের প্রয়োজনের কথা তখন ভাবাই হয় নি। 'তখনকার দিনে চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা করা ও গলা মোটা করে গভর্মেণ্টকে জুজুর ভয় দেখানোই' বীরত্ব বলে গণ্য করা হত। একথা সেদিন কিছুতেই বোঝানো হয় নি যে 'সরকারবাহাদুর-নামক একটা অমানবিক প্রভাব ছাড়া আমাদের অভাবনিবারণের' অন্য উপায় আমাদের হাতেই আছে। এবং সেটা বুঝতে পারা যায় নি বলেই 'আমরা নিজের দেশকে নিজে যথার্থভাবে হারাই। আমাদের নিজের দেশ যে আমাদের

নিজের হয় নি তার প্রধান কারণ এই যে, যে-দেশে দৈবক্রমে জন্মেছি মাত্র সেই দেশকে সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জানার দ্বারা, বোঝার দ্বারা সম্পূর্ণ আত্মীয় করে তুলি নি—একে অধিকার করতে পারি নি।···আমরা কংগ্রেস করেছি, তীব্র ভাষায় হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যে সব অভাবের তাড়নায় আমাদের দেহ রোগে জীর্ণ, উপবাসে শীর্ণ, কর্মে অপটু, আমাদের চিত্ত অন্ধসংস্কারে ভারাক্রান্ত, আমাদের সমাজ শত খণ্ডে খণ্ডিত, তাকে নিজের বুদ্ধির দ্বারা, বিদ্যার দ্বারা, সংঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা দূর করবার কোনো উদ্‌যোগ করিনি। কেবলই নিজেকে এবং অন্যকে এই বলে ভোলাই যে, যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।' স্বরাজ বা স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু আপনিই যে ঠিক হয়ে যায় নি, তা বুঝতে আমাদের স্বাধীনতার পরে চারটি দশক অতিক্রম করতে হয়েছে, আরও কতদিন যাবে তা কে জানে; আর রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন ১৯৩১ সালে।

রবীন্দ্রনাথের ধারণায় দেশের মর্মস্থান সমাজে, রাষ্ট্রতন্ত্রে নয়। ইংরেজ শাসনকালে রাষ্ট্রিক আন্দোলন রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি তার দৃষ্টি এবং লক্ষ্যকে নিবদ্ধ রেখেছিল, ফলে রাষ্ট্রক্ষমতা নামক একটি জাদুর উপর ঐকান্তিকভাবে নির্ভরশীল হতে হয়েছে। এবং এই জাদু-নির্ভরতাই নিজেদের উদ্যোগ হারাবার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ফলেই মানুষকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল, 'যেদিন স্বরাজ হাতে আসবে তার পরদিন থেকেই সমস্ত আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।' এ স্বরাজ হল রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর অধিকার। কিন্তু 'চিরদিন ভারতবর্ষে এবং চীনদেশে সমাজতন্ত্রই প্রবল, রাষ্ট্রতন্ত্র তার নীচে।···দেশের উপর দিয়ে রাজ্য-সাম্রাজ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল, স্বদেশী রাজায়-রাজায় নিয়তই রাজত্ব নিয়ে হাত-ফেরাফেরি চলল, বিদেশী রাজারা এসে সিংহাসন-কাড়াকাড়ি করতে লাগল, লুঠপাট অত্যাচারও কম হল না, কিন্তু তবু দেশের আত্মরক্ষা হয়েছে—যেহেতু সে আপন কাজ আপনি করেছে—তার অন্নবস্ত্র ধর্মকর্ম সমস্তই তার আপনারই হাতে। এমনি করে দেশ ছিল দেশের লোকের, রাজা ছিল তার এক অংশে মাত্র···রাষ্ট্রপ্রধান দেশে রাষ্ট্রতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে দেশের মর্মস্থান, সমাজপ্রধান দেশে দেশের প্রাণ সর্বত্রব্যাপ্ত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের পতনে দেশের অধঃপতন, তাতেই সে মারা যায়। গ্রীস রোম এমনি করেই মারা গিয়েছে।' কিন্তু ইংরেজ-শাসনে 'গ্রামে গ্রামে তার যে সামাজিক স্বরাজ পরিব্যাপ্ত ছিল, রাজশাসন তাকে অধিকার করলে।···এইখানেই দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। দেশের লোকের সঙ্গে দেশ যথার্থভাবে সেবার সম্বন্ধসূত্রে যুক্ত, সেইখানেই ঘটেছে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ। আগে স্বরাজ পেলে তবে সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের কাজ চলতে থাকবে একথা বলাও যা, আর আগে ধনলাভ হবে তার পরে ছেলে মাকে স্বীকার করবে একথা বলাও তাই।' রবীন্দ্রনাথ যাকে 'সমাজতন্ত্র' বলেছেন, তা নিশ্চয়ই 'সোস্যালিজম্ নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য যখন বলা হয় রাষ্ট্রতন্ত্রহীনতা (state shall wither) তখন রবীন্দ্রনাথের ধারণার সঙ্গে তার এক সাধর্ম্য দুর্লক্ষ্য মনে হয় না। এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রতন্ত্রহীনতার লক্ষ্য ক্রমেই সুদূরপরাহত হয়ে পড়ছে, এই ঘটনায় মনে হয় সেসব দেশের মজ্জায় রাষ্ট্রপ্রাধান্য সহজে যাবার নয়, যা হয়তো বা রবীন্দ্রনাথ-পরিকল্পিত 'স্বদেশীসমাজ'-ভিত্তিতে এদেশে সহজ-উপনয়যোগ্য। কিন্তু রাষ্ট্রতন্ত্রের পাকদণ্ডীতে প্রবেশ করে সে সম্ভাবনাকে এদেশেও অনর্জিতব্য করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপ্রাধান্যবাদ থেকে জন্ম নিয়েছে জাতীয়তাবাদ—যার শেষ বিকৃত পরিণতি ফ্যাসিবাদ। অথচ সকলেই বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে সবকিছুর পিছনে আছে দেশপ্রেম। সেবা আর ভালোবাসার দ্বারা দেশকে পাওয়া এক জিনিস আর অধিকার এবং

ভোগের জন্য দেশকে চাওয়া অন্য। ভোগের পথেই আসে অহংকার। সেই অহংকার থেকেই জন্ম নিয়েছে ফ্যাসিবাদ। গোষ্ঠী-স্বার্থে রাষ্ট্রক্ষমতার জবরদস্ত প্রয়োগ উগ্র জাতীয়তাবাদের লক্ষণ। দেশপ্রেমের নামাবলী সেখানে নিছকই ছলমাত্র। এই তত্ত্বটি পৃথিবীতে এখনও বুঝতে কিছু বাকি থেকে গেছে। নইলে জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমকে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করা হত না। এদেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলনে এই উগ্র জাতীয়তাবাদের ছোঁয়া ছিল না একথা জোর করে বলা যায় না। ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতির বহু বৈচিত্র্যের দেশে গোষ্ঠীবিশেষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস সেই উগ্রজাতীয়তাবাদেরই লক্ষণাক্রান্ত। উগ্র জাতীয়তাবাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন ১৯১৬ সালে জাপানে পৌঁছে। সেদিন ফ্যাসিবাদের ধারণা অনেক রাষ্ট্রনেতারই মনে ছিল না। এর আগেও য়ুরোপের মানবিকতাবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যখনই সশ্রদ্ধ মন্তব্য করেছেন, তাকে ইংরেজের খোসামোদ বলে ব্যাখ্যা করার অপপ্রয়াস দেখা গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মানবিকতাবাদের সমর্থন পাওয়া গেছে মার্কসবাদীদের আন্তর্জাতিকতাবাদে। রবীন্দ্রনাথ যে মানবিকতাবাদের কথা বারে বারে বলেছেন 'শ্রেণীনির্বিচারে ন্যায়সংগত ব্যবহারের সমান-অধিকারত্ব', যাকে বলা যায় 'মানুষের শ্রদ্ধেয়তা', তার বোধ যেমন এসেছিল রেনেশাঁস-রিফরমেশন-ফরাসি-বিপ্লব- শিল্প-বিপ্লব-আলোকিত য়ুরোপ থেকে, তার সংকটও তেমনি দেখা দিয়েছিল য়ুরোপের ভূখণ্ডেই। 'য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান স্থান নিতে পারে জর্মনি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিলে···কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ।' রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালেই ইঙ্গিত করেছেন হিটলারি জর্মনিকে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের মনেও যেন সংশয় দেখা দিয়েছিল, 'মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে?' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কঠিন সংকটমুহূর্তে সেই সংশয় তিনি কাটিয়ে উঠলেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।···মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।' যে মানব-অভ্যুদয়ের মহাজন্মের লগ্নের প্রত্যাশায় তিনি জীবনের শেষ বাণী উচ্চারণ করে-ছিলেন তারই অপর নাম বিশ্বমানব। এদেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলনে এই বিশ্বমানবের ভাবনা তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা পায় নি। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ মানবতা-বাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

জাতীয়তাবাদের আবেদন রবীন্দ্রনাথকে কখনোই প্রভাবিত করে নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'মানুষ মানুষকে মাড়িয়ে যাবে এটা, যে-লোক মাড়ায় এবং যাকে মাড়ানো হয় কারও পক্ষে কল্যাণের নয়।··· প্রত্যেক মানুষের যে-দেশে মূল্য আছে, সমস্ত জাতি সে-দেশে আপনিই বড়ো হয়।···যে জাতি উন্নতির পথে বেড়ে চলেছে তার একটা লক্ষণ এই যে,··· সেখানে মানুষ ভাবছে কী করলে সেখানকার প্রত্যেকেই ভদ্র-বাসায় বাস করবে, ভদ্রোচিত শিক্ষা পাবে, ভালো খাবে, ভালো পরবে, রোগের হাত থেকে বাঁচবে, এবং যথেষ্ট অবকাশ ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। কিন্তু, আমাদের দেশে কী হয়েছে? আমরা বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবস্থার দ্বারা সমাজের অধিকাংশ লোককেই খাটো করে রেখেছি।···যারা নীচে পড়ে আছে সংখ্যায় তারাই বেশি।' এই নীচে পড়ে-থাকা সংখ্যাধিকদের নিয়েই আজকের সব আন্দোলন সব বিপ্লব। রুশ-বিপ্লব তখনো ঘটে নি, ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'ইহার পরে আর-একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন

মন্বন্তর পড়িবে।' শ্রেণী-বিপ্লবের এত স্পষ্ট ভবিষ্যদ্-বাণী এদেশে আর কেউ করেন নি। শুধু শ্রেণী-বিপ্লবের কথাই নয়, তিনি যখন বলেন, 'সম্প্রতি পৃথিবীতে বৈশ্যরাজক যুগের পত্তন হইয়াছে। বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেছে।' তখন মনে হয় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষা তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল না।

তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'পোলিটিকাল আন্দোলনে যোগ দেওয়া আমার স্বধর্মবিরুদ্ধ', তখন তার যথার্থ তাৎপর্য অন্যভাবে প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্র-নাথ স্বধর্মের দোহাই পেড়ে রাষ্ট্রিক আন্দোলন থেকে পলায়ন করতে চান নি, এদেশে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের ধারাটি বস্তুত ছিল ধর্মচ্যুত। অযোগ্য অনুদার সংকীর্ণ প্রত্যাশী রাষ্ট্রনেতৃত্বের হাতে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বিপথচারিতা রবীন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্রকে রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে ঠেলে দিয়েছে। তাতে হীনবল হয়েছে এদেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলনই—রবীন্দ্রনাথের মতো নেতার প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত থেকেছে দেশের রাষ্ট্রিক আন্দোলন।

বন্দিনিবাস

রবিশংকর বল

মাথার ওপরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ। মধ্যবৈশাখের আকাশ মেঘহীন। সৈকতের মনে হয়, সে যেন অনেকক্ষণ হাঁটছে। অথচ ট্রাম থেকে নেবেছে মিনিট তিনেকও হয়নি। ইদানীং রোদ্দুরে একটু হাঁটলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। ক্লান্তি থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য হয়তো একটা সিগারেট ধরায়, কিন্তু প্রতিটি টানের সঙ্গে সঙ্গে তখন শ্বাসক্রিয়ার ওপর তৈরি হয় চাপ। হাঁপাতে থাকে সে। দুপুরবেলা এদিকের রাস্তায় এখন লোক নেই বলতে গেলে। এমনিতেই গ্রীষ্মের দুপুর ভয়ানক নিঃসঙ্গ। তার সঙ্গে মেশে জনহীনতা, যা এই নিঃসঙ্গতাকে করে তোলে গিলোটিনের ব্লেডের মতো ধারালো আর নিষ্ঠুর। আরো মিনিট পাঁচেক লাগবে জয়াদির বাড়ি পৌঁছতে, সে ভাবল। আসলে এই দুপুরবেলা টালিগঞ্জ থেকে একবালপুরে আসার কোনো দরকার ছিল না। জয়াদির সঙ্গে সন্ধেবেলাই দেখা হওয়ার কথা। তখনই দেওয়া যেত নতুন টিউশনির খবরটা। কিন্তু দুপুরগুলোতে তার কিছু করার নেই, নিদ্রাহীন বিছানায় কোনো বই নিয়ে এপাশ-ওপাশ করা ছাড়া। এটা একটা কারণ। কিন্তু আরও কিছু কি সে চেপে যাচ্ছে? নিজের কাছেই? ধরা যাক, জয়াদিকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখবার ইচ্ছেটা! এই ভাবনার মুখোমুখি হয়ে নিজের ভিতরেই কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে। এমনকি ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াতেও হল তাকে। না, না, জয়াদি আসাদদার স্ত্রী…আসলে জয়াদি বড় একা…রিঙ্কুটা তো খুব ছোট…একটা আদর্শের জন্য জেলের ভিতরে এখনও ক্ষয়ে যাচ্ছে আসাদদা…জয়াদি সত্যিই একা…। এইসব এলোমেলো ভাবতে ভাবতে আবার হাঁটতে থাকে সৈকত। সে অনুভব করতে থাকে, ছেঁড়াখোঁড়া ভাবনার মধ্য দিয়েই কীভাবে একটা অবয়ব তৈরি হয়ে উঠছে জয়াদির··মাঝারি উচ্চতা, রোগা, ফর্সা, এলো খোঁপা গড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর, হ্যাঁ মোটা দুটি ভ্রু কপালের মাঝে এসে প্রায় জুড়ে গেছে…অদ্ভুতভাবে গলার ভিতরে যেন একটা

মরুভূমি তৈরি হয়ে যায় সৈকতের। ভাবনাগুলিকে এড়ানোর জন্যই যেন এবার সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় জয়াদির ঘরের বন্ধ দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সৈকত। হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, দুটো বেজে গিয়েছে। জয়াদি নিশ্চয়ই এখন রিঙ্কুকে নিয়ে শুয়েছে। একবার মনে হয়, ফিরে যাওয়া যাক। সঙ্গে-সঙ্গেই যেন সেই গানটি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে…'পুষ্প দিয়ে মারো যারে'…দুদিন আগে সন্ধেবেলা এ-বাড়িরই ছাদে বসে গেয়েছিল জয়াদি। ঈষৎ ভাঙা, অথচ স্টেডি, জয়াদির কণ্ঠস্বর সেদিন সন্ধ্যার হাওয়ায় ভাসছে, কী ভীষণ একা, যখন 'চিনলো না সে, চিনলো না মরণকে'…এই লাইনটি কোনো খনিগর্ভ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে যেন। সৈকত কলিং বেলের বোতামে আঙুল রাখল।

একমুখ হাসি নিয়ে রিঙ্কু দরজা খোলে। তারপরই সে চেঁচায়, 'মা, সৈকতকাকু—'।

সৈকত ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে। দরজার পাশে চটি খুলতে-খুলতে ঘরের কোণে রাখা টেবিলটার দিকে চোখ চলে যায় তার। এভাবেই প্রতিদিন। যখন সে জয়াদির বাড়িতে আসে। টেবিলের ওপর স্টিলের ফ্রেমে বাঁধানো আসাদদা আর জয়াদির ছবি। তখনও ওঁদের বিয়ে হয়নি। জয়াদির কোলে আসাদদার সেই শরীরের তুলনায় বড় মাথা। আর আসাদদার ঘন চুলে জয়াদির হাতের স্পর্শ। জেল-বন্দী আসাদ-দার এখনকার চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই ওই ছবির। এখন তো একটা কঙ্কাল। সৈকত হাঁটু গেড়ে বসে রিঙ্কুকে জড়িয়ে ধরে। ঠিক আসাদদার চোখ, বড় বড়, ঈষৎ স্ফীত মণি আর চিবুকটা তো যেন একেবারে আসাদদা কেটে বসানো। রিঙ্কু তার আলিঙ্গনের মধ্যে ছটফট করে। 'মামণি কী করছে?' সৈকত জিজ্ঞেস করে।

'আমাকে খাইয়ে এইমাত্র খেতে বসল।' রিঙ্কুর কথা শেষ হতেই জয়াদির কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে, 'খেয়ে এসেছ, সৈকত?'

ভেতরদিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জয়া। সৈকত নিজের অজান্তেই ভেতরে ভেতরে কেমন কেঁপে ওঠে। আন্দোলনটা ঘটে যাবার পরই সে প্রতিবার বুঝতে পারে। কেন এমনটা হয়? সৈকত সহজ হবার চেষ্টা করে বলে, 'তুমি খেয়ে নাও। আমি খেয়ে এসেছি।' বলতে-বলতেই সে রিঙ্কুকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। 'কোনো জরুরি খবর আছে নাকি?' জয়ার কণ্ঠস্বর এখন খাদে। ভাবখানা এমন সে যেন দেওয়ালকেও অবিশ্বাস করছে।

'জরুরি, তবে তেমন কিছু নয়। তুমি খেয়ে এসো।' সৈকত বলে। দক্ষিণের জানালার কাছে বিছানার ওপরে গিয়ে বসে সে। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয় তার। সন্ধেবেলা তো সবার মাঝেই জয়াদির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল, তবু এভাবে সে চলে এল, কীরকম গোপনে, একরকম নিজেকেও চোখ ঠেরে। দেড় দশকের বেশি অতিক্রম করে এসেছে তারা সেইসব ঘটনাবলীর পর—যার মধ্যে কারাবাস, শাসকদলের রঙ বদলানো, বন্দিমুক্তি, কত কী ঘটে গেল। অবশ্য আসাদদাকে ওরা জেলেই আটকে রাখল—হ্যাঁ দেড়দশকের বেশি, যার মধ্যে দেয়ালগুলিকে ফের চুনকাম করা হল, জ্যোতি বসুর ছবি পোস্টার হয়ে এসপ্লানেডে বিক্রি করা শুরু হল—আরও কত ঘটনা যার ফলস্বরূপ কলকাতাবাসীরা আবার তাদের নিশ্চিন্তির জীবন ফিরে পেল। যুব-শক্তিকে আশা ৮৬-তেও শামিল করা হয়েছে ইতিমধ্যে। অথচ তারা, মাত্র কয়েকটি হাতগুনতি মানুষ, যেন এখনো আণ্ডারগ্রাউণ্ডের বাসিন্দা। সৈকতের মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসে। যেমন একটু আগেই জয়াদি কণ্ঠস্বরকে খাদে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোনো জরুরি খবর আছে নাকি?' এইরকম তারা সকলেই দিনের পর দিন তৈরি করে নেয় জরুরি-অবস্থাকালীন এক পরিবেশ। কেউ তোমাকে দেখছে না, কেউ আগ্রহী নয় তোমার প্রতি, তবু তুমি

দেয়ালের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছ, ফিসফিস করে কথা বলছ। এর অর্থ কী? সৈকত কিছু বলতে পারে না, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে উত্তেজিত হয়ে পড়ে সে। তার মানে তো এই যে, জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়েও শেষপর্যন্ত ওরা আমাদের বন্দী করতে পারল, দেড়-দশক আগের পরিস্থিতির অভ্যাসের মধ্যে, গোপনীয়-তার এক দুর্গ নির্মাণের শ্রমিক হিসেবে যেন। তার মনে পড়ে যায় সেই কথাটা, ইতিহাসের সব ঘটনা ও ব্যক্তিরা দুবার হাজির হয়। প্রথমবার বিয়োগান্ত নাটকের রূপে, দ্বিতীয়বার প্রহসন হিসেবে।

রিঙ্কুটা আবার এসেছে। বিছানায় উঠে সে সৈকতের চুল নিয়ে খেলায় মাতে। এই মেয়েটাকে জয়াদি যে কী করে সামলায়, যা দুষ্টু। জয়াদি এক-দিন বলেছিল, 'আসাদও এইরকম দুরন্ত ছিল ছেলে-বেলায়।' সৈকত জানে, আসাদদা ও জয়াদির বন্ধুত্ব ছেলেবেলা থেকে—যা একসময় পরিণত হয়েছিল প্রণয়ে। আসাদদার সঙ্গে জীবনের পথ কেটে নেবার ব্যাপারটা জয়াদির বাড়ির লোকরা মেনে নেয়নি। আসাদদাকে বিয়ে করে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে হয়েছিল। বাড়ির দিক থেকে একমাত্র সমর্থন ছিল জয়াদির বড়দা অনুপমবাবুর। ইতিহাসের ঝোড়ো হাওয়া আসাদদার জীবনকে যখন ঝরা পাতার মতো যত্রতত্র উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, তখনই বোনের জন্য এই ফ্ল্যাটটির ব্যবস্থা করেছিলেন অনুপমবাবু। ভাড়া মেটানোর দায়িত্ব তাঁর। রিঙ্কু আর নিজের খরচ জয়াদিকে চালাতে হয় গানের টিউশনি করে। এখনও সেভাবেই চলছে।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন পারবে জয়াদি? আসাদদাকে ওরা জেল থেকে মুক্তি দেবে না। আর আসাদদার স্বাস্থ্য দিনে-দিনে যে অবনতির দিকে এগোচ্ছে, তাতে যে-কোনো সময় সেলের মধ্যেই মৃত্যু হতে পারে তাঁর। কিন্তু কিভাবে পারছে জয়াদি? সাতাত্তর সালের পর থেকেই এ-প্রশ্নটা আরো বেশি করে সৈকতকে চঞ্চল করে তোলে। আসাদদার বহু নেতৃস্থানীয় বন্ধুবান্ধব ও আরো অনেক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি মিলল, কিন্তু আসাদদাকে ওরা ছাড়ল না। অথচ জয়াদিকে এজন্য আসাদাভাবে ভেঙে পড়তে দেখেনি সে। যেন আসাদদা আর জয়াদির ভবিতব্যই এই, এভাবে আলাদা হয়ে থাকা। দীর্ঘ পনেরো বছর এমন নির্মম দূরত্বকে মেনে নিয়েও কীভাবে দুটি নারী-পুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসে? প্রশ্নটা মনে জাগতেই সৈকত আবার সচেতন হয়ে পড়ে। এ-প্রশ্ন উঠছে কেন? সে কি আসাদদা আর জয়াদিকে অবিশ্বাস করে? অথচ প্রশ্নটা মাঝে-মাঝেই আক্রান্ত করে তাকে।

আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে জয়া ঘরে ঢোকে। তারপর বিছানার পাশেই হাতলওলা চেয়ারটিতে সে পা তুলে বসে।

'কী রান্না করেছ?' সৈকত জিজ্ঞেস করে।

'রিঙ্কু তুমি ঘুমোবে না?' সৈকতের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জয়া রিঙ্কুর দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর সৈকতকে বলে, 'এসে ভালোই করেছ সৈকত। আজ সকাল থেকে মনটা একেবারে ভালো নেই।'

সৈকত কোনো কথা বলে না।

'রিঙ্কু, তুমি ও-ঘরে শুয়ে পড়ো।' জয়াদির কণ্ঠস্বরে এক নিস্পৃহ আদেশের সুর টের পায় সৈকত।

রিঙ্কু কোনো কথা বলে না। ধীরে-ধীরে পাশের ঘরে চলে যায়।

রিঙ্কু ঘর থেকে চলে যেতেই অচেনা এক পরিস্থিতি যেন জয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আসলে ব্যাপারটাকে ঠিক 'অচেনা' শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না, সে বোঝে; কিন্তু অন্যভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতাও তার নেই। বলতে পার এক শানিত পরিস্থিতি, যেখানে একটি ঘরে জয়া ও সৈকত বসে আছে। কিছু-কিছু পরিস্থিতি আছে যা ভিতরে-ভিতরে এক আন্দোলনকে বহন করে এবং এইরকম সময়ের স্পর্শেই যেন জয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়।

'তা, কী খবর শুনি।' গুমোট ভেঙে জয়া কথা বলে ওঠে। শেষের 'শুনি' শব্দটা অনেকখানি তার গলার মধ্যেই আটকে থাকে। অনেকটা শিশুধ্বনির মতো শোনায়। সৈকত যখন এল তখন কোনো একটা খবর শোনার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, জয়া ভাবে, কিন্তু খেতে-খেতে, পাশের ঘরে সৈকত বসে আছে এই ভাবনায় বার-বার ধাক্কা খেয়ে একসময় সে আবিষ্কার করেছিল নিজের ভিতরকার পরিবর্তন। সৈকতের সান্নিধ্যে এলেই এইরকম বদল ঘটে যাচ্ছে তার ভিতরে। এক বছরেরও বেশি সময় হতে চলল। এই অনুভূতি তার জীবনে আগে আসে নি। আসাদের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল প্রেম করেই, কিন্তু সেক্ষেত্রে আসাদ একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যেমনভাবে মানুষ ও সময়ের মুখর আন্দোলনেও ঝাঁপ দিয়েছিল সে। আসাদ তোমাকে আমি পাগলের মতো ভালো-বাসি। জয়ার মনে হল, এই উচ্চারণ মুখর-ভাষারূপ নিলে তার সঙ্গে কান্নাও ঝরে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে? সৈকতের সান্নিধ্যে যে বদল তার ভিতরে ঘটে যায় তা বড়ো মারাত্মক। সৈকত পাশে থাকলে, মুখোমুখি দাঁড়ালে বা কাছাকাছি যদি থাকে, তাহলেই যেন অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে, হ্যাঁ বিশ্বাস করো, এমনকী ওর শরীরটা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পরক্ষণেই জেগে ওঠে এক অমোঘ প্রত্যাখ্যান। না, কিছুতেই সম্ভব নয়। সৈকত, আমি তোমাদের আসাদদার স্ত্রী, শুধু একটা মানুষের জন্য নয়, আদর্শের জন্য আমি এতগুলো বছর এই একাকিত্বকে বহন করছি। এ তো এক ধরনের বৈধব্য। প্লাজ সৈকত—

'তুমি আমার কথা শুনছ না, জয়াদি?' সৈকত জয়ার মুখের দিকে তাকায়। জয়াদির দৃষ্টি এক শূন্যতাকে আঁকড়ে স্থির। এই দৃষ্টির অর্থ সে জানে। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তগুলোতেই, সে লক্ষ করেছে, জয়াদি যেন অন্য এক জগতে চলে যায়। এইরকম দৃষ্টির এক মানুষের মধ্যে ভীষণ রকম এক লড়াই চলছে, সে বুঝতে পারে। নিজেকে আবার অপরাধী মনে হয় তার। সে-ই কি এভাবে জয়াদিকে এক দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? কিন্তু সে তো লক্ষ করেছে, তাকে ঘিরে জয়াদির মধ্যকার টানা-পোড়েনেরও খণ্ডচিত্র। বেশির ভাগ দিন সন্ধেবেলা সবাই যখন নিমাইদার বাড়িতে মিলিত হয়, তখন জয়াদির তার মুখোমুখি বসবার প্রবণতা, কোনো বিষয় নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্কের মধ্যে সব ভুলে গিয়ে তার দিকে জয়াদির চেয়ে থাকা। কেন, তার প্রতি কেন এমন অনুরক্ত হয়ে পড়ছে জয়াদি? নিমাইদা এসব কথা শুনলে নিশ্চয়ই বলত, 'আসাদটা জেলে পচছে, আর তোমরা এসব পাতিবুর্জোয়া সেনটিমেনট নিয়ে খেলছ।'

'জয়াদি—' সে ডাকে।

'কী বলছিলে তুমি সৈকত—।'

'তোমার মন ভালো নেই বলছিলে। কী হয়েছে?'

জয়া হাসে। তারপর বলে, 'তুমি কী খবর নিয়ে এসেছ?'

'তোমার জন্য আর-একটা টিউশানি জোগাড় করলাম।' সৈকত বলে।

'আবার টিউশানি! আর ভালো লাগে না। এত মেয়েকে গান শেখাতে-শেখাতে নিজেই গাধা বনে যাচ্ছি।'

সৈকত হাসবার চেষ্টা করে। আমতা-আমতা করে বলে, 'তুমই তো বলছিলে, আর-একটা টিউশানি হলে ভালো হয়। এরা টাকাও ভালো দেবে।'

'এমনি বললাম। করতে তো হবেই। আচ্ছা সৈকত, তুমি এভাবে আস কেন?' নিস্পৃহ চোখে সৈকতের মুখের দিকে তাকায় জয়া।

এইরকম প্রশ্নের মুখোমুখি হবার কথা সৈকত ভাবেনি। সে অনুভব করে, মুহূর্তের মধ্যে তার সারা মাথা জুড়ে এক বিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে। সারা মুখ-মণ্ডল যেন প্রবল এক জ্বরের উত্তাপে ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে। সে কোনো কথা বলতে পারে না।

'খবরটা তো তুমি সন্ধেবেলায় দিতে পারতে।' জয়ার কণ্ঠস্বর এখন দৃষ্টির নিস্পৃহতাকে অতিক্রম করে কঠিন।

সৈকত কোনো কথা বলে না।

'মুখ ফুটে সত্যি কথাটা বলতে পারছ না?' জয়ার ঠোঁট এক অদ্ভুত হাসিতে বেঁকে যায়।

কী বলবে সে? আমি তোমাকে ভালোবাসি? এই নিঃশর্ত উচ্চারণটাই কি শুনতে চায় জয়াদি? কথাটা তো সে বহুবার মনে-মনে উচ্চারণ করেছে··· আমি তোমাকে ভালোবাসি জয়াদি··· আমি তোমাকে ভালোবাসি জয়াদি···আমি তোমাকে ভালোবাসি জয়া···যে উচ্চারণ তাকে যেন নিয়ে যায় কোনো এক শীতের ভোরের ভিতরে, কুয়াশা-ঢাকা, মায়াময় এক ভোরে। অথচ পরক্ষণেই জেগে উঠেছে জেলখানার ভিতরে আসাদদার ছবিটা, পুলিশি অত্যাচার আর রোগে জীর্ণ একটা হাড়ের খাঁচা। মনে হয়েছে, কঙ্কাল-সার দুটি হাত এগিয়ে আসছে তার গলাকে লক্ষ্য করে, সাঁড়াশির মত যেন তা চেপে বসবে, হত্যা করবে যাবতীয় শুদ্ধ উচ্চারণ। সে নিশ্চিত জানে ওই হাত আসাদদার নয়। অন্য কারো, যে মৃত, অথচ যাকে তারা এখনো বহন করে চলেছে। আর বন্দী আসাদদা এখনও মৃতের শিয়রে যেন নিশিযাপন করছে।

'আমি যাচ্ছি।' সৈকত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

'নিমাইদাকে বোলো আমি আজ যাব না। শরীরটা খারাপ।'

সৈকত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কষ্ট পেয়ো না সৈকত।' জয়ার মুখে মলিন হাসি, 'অনেক সত্যই আমরা সারাজীবনেও বলতে পারি না।'

সৈকত চলে যাবার পর বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে জয়া। মুখ ফুটে সত্যি কথাটা বলতে পারছ না? সে জিজ্ঞেস করেছিল সৈকতকে। কিন্তু নিজেই কি সে বলতে পেরেছে? সত্য তো একটাই—আমি তোমাকে ভালোবাসি—সৈকত। কথাটা ভাবতে গেলেই আসাদ কি সামনে এসে দাঁড়ায়? বন্দী আসাদ। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। উস্কোখুস্কো চুল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত। যেন এইমাত্র কোনো পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে তার ওপর। পায়ুছিদ্র দিয়ে রুল ঢুকিয়ে··· উঃ···আসাদ, আমি তোমাকে ভালো-বাসি। কিন্তু কাকে ভালোবাসে সে? কোন্ আসাদকে? এ-প্রশ্ন তো বহুদিন থেকেই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কত দীর্ঘ দিন, যেন বছরের একক দিয়েও মাপা যায় না, তারা পাশাপাশি থাকে নি, শুধু জেলখানায় কিছুক্ষণের জন্য চোখের দেখা আর কয়েকটি কথা। মাঝে-মাঝে মনে হয়, আসাদ, তার স্বামী, একজন আনকমপ্রোমাইজিং বিপ্লবী—শুধু এইরকম কতগুলি শব্দ, কতগুলি আদর্শের নিরবয়ব রূপকেই ভালোবাসে সে। রক্তমাংসের কোনো মানুষকে নয়, সেই আসাদকে নয় যে বিয়ের আগে কোনো সম্ভোগের মুহূর্তে রক্তাক্ত করেছিল তার স্তন। এক-একদিন রাতে এইসব স্মৃতির ভিতরে ফিরে যেতে-যেতে কী এক শিহরনে কেঁপে ওঠে সে। সে-মুহূর্তে মনে হয়, এই শরীর কোনো অগ্নিশিখা! এত-গুলি বছরে আসাদ তার জীবনে রক্তমাংসের অস্তিত্ব হারাতে-হারাতে কোন আইডিয়া যেন! আসাদও তা জানে। তাই জেলখানায় দেখা করার সময় এক-বার আসাদ বলেছিল, 'তুমি এভাবে আর কতদিন বেঁচে থাকবে জয়া?'

'আমি তো ভালো আছি', সে বলেছিল।

'গোপন কোরো না জয়া। এটাকে মানুষের মতো বাঁচা বলে না।'

আসাদ তাকে আবার বিয়ে করার কথা বলেছিল। আমি পারব না আসাদ। কেউ কেউ হয়তো এটাকে সংস্কার ভাবতে পারে। কিন্তু আসাদকে ছাড়া অন্য কাউকে সে মনেও আনতে পারে না। তাহলে সৈকত কীভাবে এল তার জীবনে? এ-প্রশ্নের উত্তর সে জানে না। এল। খুব ধীরে-ধীরে, কোনো কঠিন রোগের আক্রমণের মতো যেন। এ-কথা সে আসাদকে জানাতে চেয়েছে। তাদের জীবনের মাঝে তো কোনো অন্তরাল ছিল না। কিন্তু এতগুলি বছরে এক অন্তরাল তৈরি হয়েছে, সে বুঝতে পারে। ইচ্ছে থাকলেও বার-বার তাকে ফিরে আসতে হয়েছে কথাটা না জানিয়েই। তাহলে কি আসাদকে সে করুণা করতে শুরু করেছে? যে বন্দী-মানুষটা কষ্ট পাবে অথবা আসাদকে যতখানি জানে, তাতে করে সে হয়তো গোপনে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদবে। এ-কথা নিমাইদা বা তার পরিচিত অন্য কাউকেও বলা যায় না, সে জানে। আফটার অল, সে একজন মহান বিপ্লবীর স্ত্রী। তার কি এমন দুর্বলতা সাজে? ওরা সবাই এ-প্রশ্নই তুলবে।

জেলখানায় দেখা করার সময় আসাদ একদিন জিগ্যেস করেছিল, 'নিমাইদাদের ওখানে তোমার কেমন লাগে, জয়া?'

সে কোনো উত্তর দেয় নি। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

আসাদ নিজেই তখন অনেক কথা বলেছিল। 'ভালো লাগে না নিশ্চয়ই তোমার। জেল থেকে ছাড়া পেলে আমারও আর ভালো লাগত না। ওরা কেউ-কেউ এখানে যখন আসে, তখন আমারও কথা বলতে ভালো লাগে না। সবাই টিকিধারী, তিলক-কাটা ব্রাহ্মণ হয়ে গেছে। জয়া, আমি বিশ্বাস করি, এটা মেনে নেওয়া ভালো, উই আর রুইন্‌ড। আমাদের দিয়ে কিছু হবে না আর। সত্যি জানো···।' জয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কথাগুলি যেন কোনো ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অথচ ওরা এখনও এই লোকটাকে সুপারম্যানের সঙ্গে তুলনা করবে? যেন আসাদ জেল থেকে বেরিয়ে এলেই আবার বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু হয়ে যাবে! আসাদ রোগজর্জর, মৃত্যুর সঙ্গে তার প্রতিমুহূর্তের বন্ধুত্ব, এই সত্যটাকে ওরা কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না।

আসাদ বলে যাচ্ছিল, 'মৃত জ্ঞান মানুষকে বেশি-দূর নিয়ে যেতে পারে না। আমাদের ব্যর্থতা থেকে শুধু এটুকুই শেখবার, মানুষের অন্তর্জগতেরও একটা ইতিহাস আছে। আক্রমণে-আক্রমণে সেই জগৎ ক্ষতবিক্ষত···'

ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণের শব্দ শুনতে পায় জয়া। যেন পাহাড়ের ফাটল বেয়ে গড়িয়ে-নামা সরু স্রোত-ধারার মতো। আর ক্ষরিত রক্ত ধীরে-ধীরে জমাট বাঁধছে শরীরের মধ্যেই। হয়তো তা পাথরের মতোই ঘন হচ্ছে তাদের হৃৎপিণ্ডের চারপাশে, তাদের মস্তিষ্কে। তার মনে হয়, পাহাড়ের ওপর যেন কোনো স্যানা-টোরিয়ামে অথবা তা কোনো বন্দিনিবাস, ব্যাধিগ্রস্ত কিছু মানুষ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, পা চলে না এখন আর তাদের, স্পর্শ করার জন্য হাত এগিয়ে যায় না, ভাষা ফোটে না তাদের মুখে। অথচ সে জানে, তাদের সকলেরই কিছু বলবার আছে।

চোখ খুলে জয়া দেখল, ঘরের মধ্যে অন্ধকার ছড়িয়ে যাচ্ছে। রিন্টু নিশ্চয়ই এখনো ঘুমোচ্ছে। ওকে জাগিয়ে দেওয়া দরকার। তাকেও বেরুতে হবে টিউশনি করতে। আসাদকে তার নিজের কথাগুলি না বলে সে থাকতে পারবে না। কিন্তু কীভাবে? হয়তো সে পারবে না। যেমনভাবে সৈকতকেও বলতে পারবে না। শুধু এক বিভ্রান্ত সময়ের পুতুল হয়ে ক্রম-বর্ধমান ধ্বংসস্তূপটি দেখে যেতে হবে তাকে। তার নিয়তি ইতিহাস, এই সত্য কি সে জানত না?

পুরাণের রূপান্তর : "পতিতা" থেকে "ল্যাবরেটরি"

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ একের পর এক গল্প লিখতে শুরু করেন ১২৯৮বঙ্গাব্দ থেকে—জমিদারি দেখার সূত্রে শিলাইদহ যাওয়ার পর। পরেও সেগুলো নিয়ে রীতিমতো গর্ব করেছেন : 'আমার নিজের বিশ্বাস এই আনন্দবিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশকে দেখা আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও নেই।'[১] আবার এই ভেবে দুঃখও হয়েছিল : 'বাংলা পল্লীর সেই অন্তরঙ্গ আতিথ্য থেকে সরে এসেছি, তাই সাহিত্যের সেই শ্যামছায়া-শীতল নিভৃত বীথিকার ভিতর দিয়ে আমার বর্তমান মোটর-চলা কলম আর কোনোদিন চলতেই পারবে না। আবার যদি শিলাইদহে বাসা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি তা হলে মন হয়তো আবার সেই স্নিগ্ধ সরলতার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।'[২]

যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলছেন (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) তখন তিনি সত্যিই গল্প লেখেন ক্বচিৎ কদাচিৎ। ১৯৩৩-এ "চোরাই ধন" লেখার পর আবার গল্প লিখলেন ১৯৩৯-এ, "রবিবার"। তার অল্পদিনের মধ্যেই পর-পর বেরোল আরও দুটো : "ছোটো গল্প" (পরিবর্তিত পাঠ : "শেষ কথা") ও "ল্যাবরেটরি"। জীবনের শেষ বছরে আরও চারটি গল্প মুখে-মুখে বলে লিখিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু তার সবই খসড়া, দো-মেটে করারও সুযোগ হয় নি।

'গল্পগুচ্ছ'-র যে-সব গল্পর কথা রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে বলেছিলেন সেগুলো ১২৯৮ থেকে ১৩০৯-এর মধ্যে লেখা (১৩০৩-৪ ও ১৩০৬-এ অবশ্য কোনো গল্প বেরয় নি)। তার পর ১৩১১-য় একটি, ১৩১৪-য় একটি, আর ১৩১৮-য় দুটি গল্প বেরল। 'সবুজপত্র' প্রকাশ উপলক্ষে অনেক ক-টি গল্প লেখা হল ১৩২১-এ; তিন বছর বাদে আরও একটি। আবার গল্প লেখায় বিরতি। ১৩৩২-এ বেরল একটি, ১৩৩৫-এ দুটি, ১৩৩৬-এ একটি। হঠাৎ ১৩৪৬-এ পরপর গল্প শুরু হল। কিন্তু শরীর তখন অপটু।

'সবুজপত্র'-পর্ব থেকেই দেখা যায় : ছোটোগল্প আর 'ছোটো প্রাণ আর ছোটো ব্যথা'র বাহন নয়,

জারিত অভিজ্ঞতা বা সামাজিক সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠছে। "স্ত্রীর পত্র" (১৩২১) তো রীতিমতো থিসিস-মার্কা গল্প। কিন্তু "রবিবার"-"শেষ কথা"-"ল্যাবরেটরি" —পুরনো গল্পের ধারা থেকে এই 'তিনসঙ্গী' একেবারেই আলাদা। গ্রামের ছায়াঘন জগৎ থেকে সরে এসে আধুনিক মানুষের অন্য সমস্যার গল্প। প্রথম ও তৃতীয় গল্পে ঘটনাস্থল শহর, তিরিশের কলকাতা। দ্বিতীয় গল্পে ছোটোনাগপুরের বিজন অরণ্য। ব্যাপারটা শুধু গ্রাম থেকে চলে-আসা নয়, গল্পের ধরন-ধারনই পালটে গেছে। ছোটোগল্পের ভেতর দিয়ে আগে যা বলতে চাইতেন, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা উদ্দেশ্য নিয়ে এই গল্প তিনটি লেখা ("বদনাম" ও "প্রগতি-সংহার"ও এই ধারাতেই পড়ে)। উদ্দেশ্যটা কী?

যা হওয়া উচিত কিন্তু হয় নি—এমন চিন্তা (বলা যায়, ঈপ্সিত চিন্তা) প্রকাশের জন্যে ১২৯৮ থেকেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিয়েছিলেন মহাকাব্য-পুরাণের আখ্যান-চরিত্রের—চিত্রাঙ্গদা, কচ-দেবযানী, কর্ণ-কুন্তী, ঋষ্যশৃঙ্গ, চণ্ডালিকা। অনুরচনায় মূলের যে বিকরণ বা distortion ঘটে তার কারণটা খুব স্পষ্ট : শুধু গল্প বলাই এর লক্ষ্য নয়, বিশেষ কোনো সমস্যাকে উপস্থিত করা হচ্ছে নানা পৌরাণিক চরিত্রের ছদ্মবেশে। সমস্যাটা মূলত নারী-পুরুষ সম্পর্কের। নারী কি শুধু বাঁধতেই জানে, আর সেই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসাতেই কি প্রকৃত পৌরুষ? প্রশ্নটা নানাভাবে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কখনও বন্ধনকেই করে তুলেছেন নারীর স্বভাবধর্ম, কখনও আবার তাকে সুযোগ দিয়েছেন সেই সহজপ্রবৃত্তি পেরিয়ে যাওয়ার। দেবযানী ("বিদায়-অভিশাপ") যা পারে নি, অচিরা ("শেষ কথা") তা-ই পারল। সদু ("বদনাম") জোর গলায় বলে তার স্বামীকে, 'তুমি তো জান আমাদের দেশে দৈবাৎ দুই-একজন সত্যিকার পুরুষ দেখা দেয়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দিতে। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এই-সব সুসন্তানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্।'

এ তো গেল স্ত্রীচরিত্র। পৌরুষের আসল পরীক্ষা যে এই বন্ধন জয় করায়—তাতে ব্যর্থ হলে তার সবই ব্যর্থ—এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মত কিন্তু—কি আগে কি পরে—একেবারেই অনড়। কচ, কর্ণ, অভীক, এমনকী নবীনমাধবও একভাবে তা পারে; রেবতী একেবারেই পারে না।

নারীর বন্ধনকেও রবীন্দ্রনাথ হাজির করেছেন নানারূপে। মায়ের স্নেহপাশ বা দয়িতার প্রেমডোর —পুরুষকে তার কর্মের জগৎ থেকে যা-ই বিচ্যুত করে, তা-ই বন্ধন। কর্ণকে টলাতে পারে নি কুন্তীর কাতর অনুরোধ—রবীন্দ্রনাথের চোখে এইখানেই কর্ণের মহত্ত্ব। অচিরা বলে, 'কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবযানীর অনুরোধ এড়িয়ে, আপনি [নবীনমাধব] কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অনুনয়। একই কথা। মেয়ে-পুরুষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বে আপনি জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের।'

খুব কি ভুল হবে যদি বলি : 'মেয়েপুরুষের এই চিরকালের দ্বন্দ্বকে সমসাময়িক বাস্তবতায় হাজির করার জন্যেই 'তিনসঙ্গী'-র সৃষ্টি? অভীক ("রবিবার") আর নীহারের ("প্রগতিসংহার") চরিত্রে অনেক মিল আছে। তবু যে অভীক শেষ পর্যন্ত লেখকের-সহানুভূতি-পাওয়া চরিত্র হয়ে ওঠে (নীহার যা কিছুতেই হয় না) তার একমাত্র কারণ : অভীক এই দ্বন্দ্বে জয়ী। নিজের শিল্পীসত্তায় তার অটল আস্থা। জগতের সামনে তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই সে বেরিয়ে পড়ে জাহাজের স্টোকার হয়ে। নিজের কর্মের জগৎ সম্পর্কে এই সচেতনতা, এই পৌরুষই তার চরিত্রের ইতিবাচক দিক। বিভার সঙ্গে সুখের নীড় বাঁধার চেয়ে সে বরং বেছে নেয় অনিশ্চিত জীবন—এই সূত্রেই সে নবীন-মাধব ও নন্দকিশোরের সঙ্গী।

"ল্যাবরেটরি" নিয়ে আলোচনার সময়ে এই কথাগুলো খেয়াল রাখা দরকার। তাই এত লম্বা উপক্রমণিকা।

নারীর বন্ধন "ল্যাবরেটরি"তেও দেখা দিয়েছে নানা রূপে। একদিকে রেবতীর পিসিমা, মূঢ়তার জগদ্দল পাথর চাপানোই তাঁর কাজ; অন্যদিকে নীলা, এক femme fatale, পুরোপুরি জৈবিক অস্তিত্ব ছাড়া তার জীবনের আর কোনো দিক নেই। দু-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে সোহিনী।

নীলা যে সোহিনীরই মেয়ে (বাবা যে-ই হোক) —এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কোনো সন্দেহর জায়গা রাখেন নি। নীলা অবশ্য উত্তরাধিকারসূত্রে মায়ের 'ক্যারেক্টরের তেজ' পায় নি, কিন্তু তারও আছে 'নারীর মোহজাল বিস্তার' করার 'অসংকোচ নৈপুণ্য', মায়ের মতোই নেই 'সংস্কার মানার কোন বালাই'। 'মেয়ের ছট্‌ফটানি' দেখে সোহিনীরও 'মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য'। 'নিজের প্রথম বয়সের রসোন্মত্ততার ইতিহাস' তার খেয়াল ছিল। তাই 'নীলার জীবনে কখন্ এক সময়ে সেই অনিবার্য আলোড়নের আরম্ভ হবে এই ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকখানি ভুলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জ্ঞানের চর্চায়। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের জমি ছিল স্বভাবত উর্বরা। কিন্তু যে জ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সব মেয়ের তার প্রতি টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌঁছয় না।'

সব দিক দিয়েই সোহিনী এক বিরাট ব্যতিক্রম। অধ্যাপক চৌধুরী ঠাট্টা করে বলেন, 'শিলা ভাসে জলে! মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি।' যে-নন্দকিশোরের সাধনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সোহিনীর এত চেষ্টা, যাঁর সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তার অগাধ শ্রদ্ধা ঝরে পড়ে, তাঁর জীবদ্দশায় কিন্তু ব্যাপারটা এমন ছিল না। নন্দকিশোর বর্মা গেলে সোহিনীও তার সঙ্গ ছাড়েনি। 'সঙ্গ ছাড়ে নি, কিন্তু সায়েন্সের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে যে গাদ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অনুমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আতে আঁতে।' নন্দকিশোরও ব্যাপারটায় স্বস্তি পাননি। 'এক সময়ে নন্দকিশোরের যখন গুরুতর পীড়া হয়েছিল তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আরাম এই যে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

নিঃসপত্ন অধিকারের দাবি, সন্দেহবাতিক—সোহিনীর চরিত্রের অচ্ছেদ্য অংশ। কথায়-কথায় যতই ছুরি বার করুক, সোহিনীও আদতে 'মেয়েমানুষ'। স্বামীর 'বেদির তলায় কোনো-একজন যোগ্য লোককে' বসাতে হবে—এতেই শুধু 'মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া' যায় না। আরও অন্য দিকও আছে। নিজের সম্পর্কে সোহিনী অসংকোচ বলে, 'আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমানুষ যথেষ্ট আছে। কী ঝোঁক পেয়েছে দেখছেন না! ছেলেধরা ঝোঁক।' সত্যি কথা। চৌধুরীর কথা শুনে সোহিনী যদি রেবতীকে 'তফাতে অন্য কোথাও' বসাত, তাহলে এত বিপত্তি হত না। রেবতীর অন্তত অমন দুর্দশা হত না। কিন্তু সোহিনী চেয়েছে তার ওপর নির্বাধ নির্ব্যূঢ় স্বত্ব। রেবতী কার্যত ঘরজামাই হয়ে থাকবে, কিন্তু তাকে হতে হবে কর্মযোগী। হয়তো সোহিনীর মনোগত ইচ্ছা ছিল: নন্দকিশোর যেমন তাকে উদ্ধার করেছিলেন, অনেক নীচ থেকে 'শেষকালে তুলে বসাতে' পেরেছিলেন, গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন নিজের বিদ্যের ছাঁচে—রেবতীও তা-ই করুক নীলাকে নিয়ে।

অর্থাৎ সোহিনী চেয়েছিল এক ঢিলে দু পাখি মারতে। তার স্বামীর ইচ্ছাও পূরণ হবে—দেশের ছেলেদের জন্যে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে যাবে বেশ চওড়া করে—আবার নীলারও একটা গতি হবে। নন্দকিশোরের মতো রেবতীও নীলাকে মজাবে 'বিদ্যে দিয়ে দিনরাত'।

এইখানেই ভুল করেছিল সোহিনী। সে তো জানত, নীলা আসলে 'ভাঙন-ধরানো মেয়ে', 'আমারই মেয়ে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।' রেবতীকে প্রথম দেখেই তার খটকা লেগেছিল—এর মধ্যে পৌরুষের ম্যাগনেটিজ্‌ম্ নেই। নীলাকে দেখেই রেবতী যেভাবে বহ্নিমুখবিবিক্ষু হয়ে ওঠে, তা-ও সোহিনীর ভালো লাগে নি। 'নিজের স্বামীর অভিজ্ঞতা অনুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিদ্যাসাধনার বেড়া-দেওয়া খেত যে-সে গোরুর চরবার খেত নয়। আজ আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালো লাগল না।' তবুও রেবতীকেই সে বেছে নেয়। 'শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ' রেবতীর 'কুষ্ঠি দখল করে' আছে তা জেনেও। এইখানেই কাজ করছিল তার আত্মগর্ব, hubris: 'একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায় এই আমার পণ রইল।'

সে-পণ অবশ্য রাখতে পারল না সোহিনী। হয়তো পাশে-পাশে লেগে থাকলে হত, কিন্তু নীলা আর পিসিমার দো-টানায় জিত হল পিসিমারই। তলিয়ে যাওয়ার আগে রেবতী আর পাত্তাই দিল না সোহিনীকে। বা নীলাকে।

অথচ গোড়া থেকেই সোহিনী ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল। প্রথম দেখার পরেই তাই রেবতীকে জামাই করার আশা ছেড়ে দেয়। ঠিক করে: তার ল্যাবরেটরি দান করবে পাবলিককে। রেবতী হবে সেই ট্রাস্ট-এর প্রেসিডেনট। তাতেও খুঁতখুঁতুনি যায় নি: 'না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মানুষ কোনো কালে তাদের দুধে-দাঁত ভাঙে না।' নীলাকে সে পরিষ্কার বারণ করে দেয়, 'কোনোমতেই তুই রেবতীর কাছে ঘেঁষতে পাবি নে।' জানিয়ে দেয়, 'আমি তোকে বলে দিচ্ছি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।' তবু তার ভয় ঘোচে না। রেবতীর 'বিপদ হচ্ছে সায়ান্সে ও যত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি [অধ্যাপক চৌধুরী] যাকে মেট্রিমার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।' তাই চারজন শিখ সিপাই-এর পাহারায় রেবতীকে ল্যাবরেটরিতে রেখে সোহিনী যায় আস্থালায়, তার আইমাকে শেষ দেখা দেখতে। আর সেই ফাঁকেই নীলা এসে গ্রাস করে রেবতীকে। জাগানী সভার সান্ধ্যভোজে সোহিনীকে হঠাৎ হাজির হতে দেখে রেবতী উঠে পড়তে চায়, কিন্তু নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে।' ল্যাবরেটরির টাকা তছরূপের অভিযোগ শুনে রেবতীর 'মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড়্‌ফড়্' করে, 'শুকনো মুখে কথাটি নেই।' ঐ সান্ধ্যভোজের জন্যে যত টাকা খরচ হয়েছে সব তাকে দিতে হবে জেনে 'মনটার মধ্যে স্টীম রোলার চলাচল' করতে থাকে। তবু নীলার 'কুটিল কটাক্ষের থোঁচায় পুরুষমানুষের অভিমান জেগে' ওঠে। সোহিনীর সঙ্গে বেরিয়ে 'ল্যাবরেটরির ফর্দ অনুসারে জিনিসপত্র মিলিয়ে' দেখাতে সে রাজি হয় না।

সোহিনী তখন তার শেষ অস্ত্র ছাড়ল। নীলা নন্দকিশোরের মেয়ে নয়। সে-কথা তিনি খোলসা করে দলিল রেজিস্ট্রি করে গেছেন। জাগানী সভার পঁয়ষট্টি জন সভ্য সে-কথা শুনে—আর 'পেশোয়ারীর ভঙ্গি দেখে'—'অন্তর্ধান করলে।' সোহিনী স্বীকার করে, 'এইবার আমার মেয়ে আবার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি, কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম—গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।'

অধ্যাপক চৌধুরী ব্যাপারটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন: সোহিনী আরেকবার নিজে হাত লাগালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। রেবতীর 'আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই। তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।'

কিন্তু নীলা কি অত সহজে ছেড়ে দেবে রেবতীকে? রেবতী অবশ্য কখনোই তার লক্ষ্য ছিল না। মৃত

স্বামীর টাকায় তার সুখ মিটছে না, বাবা-র টাকাও তার চাই। আর সেই টাকা পেতে হলে চাই রেবতীকে। নইলে মোতিগড়ের রাজকুমার—যার তিনটে বিয়ে, মদ খেয়ে ঢলাঢলি করে নাইট ক্লাবে—তাকে বিয়ে করলেই হত। এখন যদি সে-টাকা না-ও পাওয়া যায়—আইনত যদি সে নন্দকিশোরের মেয়ে না-ও হয়—তবু তার মায়ের বড় পেয়ারের 'সার আইজাক নিউটন'-এর ওপর কার দখল বেশি সেটা প্রমাণ করতে হবে না? নীলা একবার সেটা পরখ করে নেয়।

'নীলা বললে, "কী গো সার আইজাক নিউটন, রেজেস্ট্রি আপিসে নোটিস তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "মরে গেলেও না।"

"বিয়েটা হবে তা হলে অশুভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

রেবতীকে কেন্দ্র করে মা-মেয়ের এই দখলের লড়াই-এ মেয়েই শেষ অবধি জিতে যেত, যদি-না হঠাৎ আর একটা ছায়া পড়ত দেয়ালে। 'পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, "রেবি, চলে আয়।"

সুড়্ সুড়্ করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।'

সোহিনী পারে নি, নীলাও পারল না, জিত হল পিসিমার। সারা গল্পে এই একবারই তিনি সশরীরে হাজির হন। কোথায় ভেসে যায় বিজ্ঞানের সাধনা, নারীসঙ্গের চুম্বকও যায় অকেজো হয়ে। পূর্ণ-গ্রাসের মতো এক ছায়া আড়াল করে সবকিছুকে।

ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি দেখতে-দেখতে রেবতীর ভেতরকার বিজ্ঞানী একবার জেগে উঠেছিল। 'জ্বলে উঠল তার দুই চোখ। চেহারাটা একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে।' মুগ্ধ হয়েছিল সোহিনী। আবার 'যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা', সে-ও কিছুদিনের জন্যে আড়াল করেছিল পিসির তর্জনী। কিন্তু শেষ জিত পিসিমার। তাঁর 'নন্-কম-বাস্‌টিবল্' আঁচলের তলাই রেবতীর শেষ আশ্রয়।

মা-মেয়ের মধ্যে প্রবল টেনশন-এর এইভাবে ইতি ঘটান রবীন্দ্রনাথ। সোহিনীর পণরক্ষা হয় না, কিন্তু মানরক্ষা হয়, মেয়ের কাছে হার মানতে হয় না।

সোহিনী আর পিসিমা—শেষ বিচারে খুব আলাদা নন। অধ্যাপক চৌধুরী একবার ঠাট্টা করে সোহিনীকে বলেছিলেন 'পিসিমা দি সেকেণ্ড'। 'এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অন্য গালে চুমো। মাঝখানে পড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে।' আপাতদৃষ্টিতে পিসিমা নিশ্চয়ই সোহিনীর উলটো মেরুর মানুষ—শতকরা একশভাগ গড়পড়তা, কোথাও কোনো কেন্দ্রছাড়া দিক নেই। নিঃসন্তান বিধবা, দায়িত্ব নিয়েছেন মা-মরা ভাইপোকে মানুষ করার, অটল অবুদ্ধি দিয়ে সব রাস্তা আগলে তাকে করতে চেয়েছেন 'ভালো ছেলে'। 'ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতনি সংসারকে অতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় করত না এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর হাতে রেবতীর পৌরুষ গেল ছাতু হয়ে। ইস্কুল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পঁচিশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।' এই পিসির কবল থেকে রেবতী কিছুতেই বেরতে পারল না—ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ন রূপময়য়া—রবীন্দ্রনাথের চোখে এইটেই তার সবচেয়ে বড়ো অপরাধ।

লক্ষ করার এই যে, এমন ভয়ঙ্কর পিসিমাকেও রবীন্দ্রনাথ (চৌধুরী মারফত) শনাক্ত করেন 'রীতিমত মেয়ে' বলে, সোহিনী ন্যায্যতই যা ভুল বোঝে।

'"তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুদ্ধির ডগার উপরে চড়ে বসে আছে একটি রীতিমতো মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি?"

"আহা, সেটা হলে তো বুঝতুম ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুক্‌ধুক্। যুবতীর হাতে বুদ্ধি খোওয়াবার বায়না নিয়েই তো এসেছে, এই তো সেই বয়েস।

তা না হয়ে এই কাঁচা বয়সে ও-যে এক মালাজপ-কারিণীর হাতে মালার গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে—না যৌবন, না বুদ্ধি, না বিজ্ঞান।"'

রেবতী যে পারবে না নন্দকিশোরের জায়গা নিতে—তার পটভূমি এইভাবেই তৈরি ছিল। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ খানিক শৌখিন নৃতত্ত্বও করে রেখেছিলেন। এক সময়ে বাঙলায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় সমাজের ঢেউ খেলত। তার ফল এ-ই। 'মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়ীতে। মা-মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষ-মহলে শুনেছ কি।' এই 'মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবুদ্ধি হয়ে যায় বৎসরা।' সোহিনীও যুক্তিটা অস্বীকার করে না। তার প্রশ্ন: 'কিন্তু শুধু পিসিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের দুলাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনো কালে পাকবে না?' পিসিমা যেভাবে রেবতীকে সর্বক্ষণ চোখে-চোখে রাখেন তার জন্যে কোনো পরিকল্পনার দরকার পড়ে না। লাগে শুধু 'মেয়েলিবুদ্ধি'। নন্দকিশোরের হাতে পড়ে সোহিনীর 'মেয়েলিবুদ্ধি চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট'। তবু সোহিনী অকুণ্ঠে স্বীকার করে: 'যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলি-বুদ্ধি বিধাতার আদিসৃষ্টি। যখন বয়স অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন সে লুকিয়ে থাকে ঝোপে-ঝাপে, যেই রক্ত আসে ঠাণ্ডা হয়ে বেরিয়ে আসেন সনাতনী পিসিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে হইল।'

ঐ 'মেয়েলিবুদ্ধি'র একটা দিক হল দখলের মনোভাব। তার থেকেই আসে সন্দেহর সংস্কার। এ বাবদেও পিসিমার সঙ্গে সোহিনীর বেশ মিল আছে। পিসিমার ছিল সন্দেহবাতিক: চোখের আড়ালে গেলেই রেবতীর ওপর তাঁর দখল চলে যাবে। তাই চলবে না পাহাড়ে গিয়ে গবেষণা বা বিলেতে পড়তে যাওয়া। সোহিনীরও সেই ভয় ছিল নন্দকিশোরকে নিয়ে। তাই তাঁকে একা বর্মা যেতে দেয় নি। অচিরার মতো বলা যায়: 'একই কথা'। দখল যেন না হারায়—সে ভাইপোই হোক আর স্বামীই হোক। নন্দকিশোর শেষ পর্যন্ত জিতেছিলেন সে-লড়াইতে। সন্দেহর বাতিকটাই দূর করে দিয়েছিলেন সোহিনীর মন থেকে। রেবতী তা পারল না। সবাই নন্দকিশোরের মতো হয় না। কেন? শুধু সোহিনী বা নীলা নয়, পিসিমারাও যে আছেন।

এইখানেই সোহিনী বিরাট ভুল করেছিল। পর্যবেক্ষণ-প্রমাণ ভুল। তার ভয় ছিল নীলাকে নিয়ে। ভেবেছিল, বিষে বিষক্ষয় হবে। নীলাকে দিয়ে কাটান হবে পিসিমার। কিন্তু মোহর চেয়ে ভয়ের শক্তি বেশি। নেশা ছুটে যায়, ভয় ঘোচে না।

সোহিনীর পরাজয় তাই "ল্যাবরেটরি"কে "শেষ কথা"র আরেক ধাপ ওপরে তুলে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনার কচ ("বিদায়-অভিশাপ") দেবযানীর আকর্ষণ এড়িয়ে ফিরে গিয়েছিল নিজের কর্মক্ষেত্রে। 'মহাভারতে'র কচের সঙ্গে তার অনেক তফাত। "শেষ কথা"র নবীনমাধব মায়ের কথা ঠেলতে পেরেছিল, কিন্তু অচিরার আকর্ষণে প্রায় ভ্রষ্ট হচ্ছিল নিজের সাধনা থেকে। অচিরাই শেষে তাকে মুক্তি দেয় (যদিও সেই মুক্তির আনন্দের মধ্যেও এক টুকরো শেকল পায়ে থেকেই যায়, 'নড়তে চড়তে সেটা বাজে')। "ল্যাবরেটরি"র কচ পিসিমাকেই এড়াতে পারে না, তো নীলা! হয়তো নীলার ফাঁদ থেকেও সে বেরতে পারত। পিসিমার 'রেবি, চলে আয়' যে আরও মারাত্মক। সোহিনীর সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় অমোঘ 'মেয়েলিবুদ্ধি'র কাছে।

সোহিনী, পিসিমা, নীলা—তিনজনেই চেয়েছে রেবতীর ওপর নিঃস্ব অধিকার। রেবতী স্বভাবতই দুর্বল, যখন যার টান বেশি তারই বশে চলে। সব টান এড়িয়ে নিজের সাধনায় লেগে থাকতে পারে না। ১৩০১-এ

কবি যে-কচের কল্পনা করেছিলেন, বাস্তবে বোধহয় তাকে কোনো দিনই দেখতে পেলেন না। তাঁর দেবযানীর আমূল পরিবর্তন হয়, অচিরা বা সহ প্রবৃত্তির সীমা পেরতে পারে। কিন্তু যে-পুরুষ 'চিত্ত-শক্তিতে নিজের আদর্শ গড়ে তোলে',প্রশ্রয় দেয় না 'প্রাণশক্তির অন্ধতা'কে—সেই পুরুষ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ কখনোই তাঁকে চোখের সামনে দেখতে পান নি।[৪] "বিদায়-অভিশাপ"-এ কচ-দেবযানী কাহিনীর যেমন মেরু-পরিবর্তন ঘটে,[৫] নব ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যানে তেমন হয়না। তপস্বীকে প্রলোভন দেখিয়ে আনা যায়, অঙ্গরাজ্যের (বা 'রামায়ণে'র কাহিনী ধরলে, অযোধ্যার) খরা ঘোচে না। বরং শিকারকে আর কষ্ট করে টোপ গিলতে হয় না, টোপই গিলে ফেলে শিকারকে।

ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম একটি কবিতা লিখেছিলেন ১৮৯৭-এ—"পতিতা"। ঠিক কোন্ উৎস থেকে কাহিনীটি বেছেছিলেন বলা শক্ত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন—সব সাহিত্যেই এর নানা রূপ প্রচলিত আছে। ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনীর এটি অন্যতম। 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' দুই মহাকাব্যেই গল্পটি পাওয়া যায়।[৬] মূল কাহিনীর চালচিত্রটুকু রেখে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছিলেন এক স্বকল্পিত নারী-চরিত্র। ঋষ্যশৃঙ্গের কী হল—"পতিতা"-য় তার উল্লেখমাত্র নেই। তার প্রভাবে একটি মেয়ের জীবন কীভাবে পালটে গেল—এই ছিল কবিতাটির বিষয়। যাকে পাঠানো হয়েছিল প্রলুব্ধ করতে, ঋষিকুমারের মুখে তার কল্যাণমূর্তির কথা শুনে সে ফিরে আসে আত্ম-ধিক্কারে জর্জর হয়ে। এ-কাহিনী একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের নিজের। কোনো সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত সূত্রে এর ইঙ্গিত পর্যন্ত থাকা সম্ভব নয়।

"ছোটো গল্প"র গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গের। 'পৌরাণিক যুগের একটি ছোটো গল্প মনে পড়ছে—ঋষ্যশৃঙ্গমুনির আখ্যান। দুঃসাধ্য তাঁর তপস্যা। নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচর্যের দুরূহ সাধনায়। অধিরোহণ করেছিলেন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-যাজ্ঞবল্ক্যের দুর্গম উচ্চতায়। হঠাৎ দেখা দিল সামান্য রমণী, সে শুচি নয়, সাধ্বী নয়, সে বহন করে নি তত্ত্ব বা মন্ত্র বা মুক্তি; এমনকী ইন্দ্রলোক থেকে পাঠানো অপ্সরীও সে নয়। সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ আঁচ বেঁধে গেল একটি ছোটো গল্পে।' বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল তাঁর "পতিতা", 'মহাভারত' বা 'জাতকে'র গল্প নয়। সবার থেকে আলাদা করে একটি মেয়ের কথা একদা তাঁর কল্পনায় এসেছিল, এবং সেটাই মনে থেকে গিয়েছিল। নিজেরই করা বিকরণকে মনে হয়েছিল 'পৌরাণিক যুগের একটি ছোটো গল্প'।

"ল্যাবরেটরি"র পঞ্চম অংশে বরং ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের আদিরূপ বা archetype দেখা যায়। সোহিনী যেভাবে রেবতীর কাছ থেকে তার স্বামীর 'সাধনার পীঠস্থানে' যাওয়ার কথা আদায় করে তার সঙ্গে 'মহাভারতে'র জনৈকা 'জরদ্‌যোষা' (বৃদ্ধা বেশ্যা) ও তার কন্যা, নিপুণতমা বেশ্যাকুমারীর মিল আছে।[৭]

গরমিলও আছে। তার তালিকা করার দরকার নেই। ঋষ্যশৃঙ্গ আর রেবতীর মধ্যেও ফারাক অনেক। কিন্তু পরিস্থিতিটা একই : রেবতীকে সোহিনীর চাই, পিসিমার আঁচলের তলা থেকে তাকে বার করে আনতে হবে তার স্বামীর ল্যাবরেটরিতে। ঋষ্যশৃঙ্গ না এলে অঙ্গরাজ্যের খরা ঘুচবে না। তার জন্যে চাই বড় রকমের প্রলোভন। তপস্বীকে অর্থ বা যশের লোভ দেখানো বৃথা। আঘাত করতে হবে একেবারে ভিতে, তার জৈবিক অস্তিত্বে। ঋষ্যশৃঙ্গের বেলায় সেই বৃদ্ধা বেশ্যার পরিকল্পনা সফল হয়েছিল। ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন নিষ্পাপ, স্ত্রীপুরুষের ভেদ জানতেন না। তপস্বী ছাড়াও যে অন্য কোনো ধরনের মানুষ আছে—তা-ই তাঁর জানা ছিল না। সুখাদ্য, সুপেয় আর নারীদেহই তাঁকে অনায়াসে সরিয়ে আনতে পেরেছিল আশ্রম আর তপস্যা থেকে। কিন্তু তাঁর তপশ্চর্যার ফল নষ্ট

হয়নি। তাঁর ভয়ে বর্ষণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন ইন্দ্র।

সোহিনীর পরিকল্পনা ছিল : একই সঙ্গে বিদ্যা আর রূপের ফাঁদ পেতে জড়িয়ে ফেলবে রেবতীকে। 'বিদ্যার জাল পেতে বিদ্বানকে টানতে চায়'—তাই বর্মার ফুলের নাম, মায় তার উদ্ভিদ্‌বিদ্যাগত পরিচয় দিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় রেবতীকে। তারপর নাটের সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করে নীলাকে। আগ্রহ জাগিয়ে তোলে মেয়ের রূপের কথা তুলে : 'আমার মেয়ে অমন আশ্চর্য রূপ পেল কোথা থেকে? বসন্তের নানা ফুলের যেন—যাক, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে।' প্রথম সাক্ষাতে নীলা একটি কথাও বলে না। শুধু রেবতীকে প্রণাম করে। আর সাজিতে সাজিয়ে দেয় ফুল। সোহিনীই উশকে দেয় 'উদ্ভব অব সায়ান্স'কে : 'দেখো, দেখো, একবার চেয়ে দেখো।' এ কাজ করার ভুল সে বোঝে অনেক দেরিতে। জড়ের ম্যাগনেটিজম তার মধ্যে হার মেনেছে জৈব ম্যাগনেটিজম-এর কাছে।

এর জন্যে দায়ী অবশ্য সোহিনী নিজেই। নীলা একবার বলেছিল, 'কখন তোমার কী মর্জি কিছুই বুঝতে পারি নে মা! ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্যে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, সে কি আমি বুঝতে পারি নি? সেইজন্যেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে চেনা-শোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নষ্ট হয়ে যায়?' কথাটা ঠিক। মেয়েকে সোহিনী ব্যবহার করেছিল টোপ হিসেবে, মেয়ের পছন্দ-অপছন্দর তোয়াক্কা না রেখেই। তাই কি নীলার রোখ চেপে গেল রেবতীকে দখল করার? 'ঐ স্টাইলের পুরুষ' যে তার চলবে না—এ তো সোহিনীরই বোঝা উচিত ছিল। নীলা ঠিকই বলেছিল, রেবতী তার 'মারবার যোগ্য শিকারই নয়'। তবু তাকে মারতে সে অমন উঠে-পড়ে লাগল কেন? সোহিনী তাকে স্পষ্ট বলে দেয়, রেবতী যদি নীলার জন্যে হ্যাংলাপনা করে 'তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে—তোর অন্নে তাকে মানুষ করিস, তোর বাপের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।' নীলা উত্তর দেয়, 'সর্বনাশ! তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন!' সোহিনী অবশ্য আগেই বুঝেছিল রেবতী সম্পর্কে তার মেয়ের অবজ্ঞা একটু বেশি বাড়িয়ে বলা : 'তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়।' সাবধানও করে দিয়েছিল : 'ওর সম্বন্ধে তোর মনের ভাব যাই হোক, ওকে যদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালো হবে না।' মায়ের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যেই যেন নীলা আরও বেশি করে ঝুঁকল রেবতীর দিকে। টাকার ব্যাপার তো আছেই, তার সঙ্গে আছে পাঞ্জা-কষার জেদ। শেষ দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন, নীলার কথার মধ্যে একটা 'নিষ্ঠুর ঠোকর' ছিল।

স্বামী মেয়েকে তার চেয়ে বেশি ভালোবাসে—মা তাই ঈর্ষা করছে নিজের মেয়েকে—এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "রবিবার"-এ বিভার প্রসঙ্গে। "ল্যাবরেটরি"র পিসিমার মতোই আরেক চরিত্র এলার মা ('চার অধ্যায়')। নীলার আদিরূপ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আর কোনো লেখায় তেমনভাবে আসে নি—গল্পে না, নাটকে না, উপন্যাসে না। কবিতায় তো নয়ই। রেবতীর ওপর দখল নিয়ে পিসিমাকে কিছুই করতে হয় নি, সোহিনী আর নীলাকেই লড়তে হয়েছে নিজেদের মধ্যে। তার জন্যেই পিসিমা অত অনায়াসে জিতে গেলেন। মা-মেয়ের এই লড়াইয়ে আপাত-দৃষ্টিতে রেবতী লক্ষ্য হলেও, আসলে সে উপলক্ষ মাত্র। ঘটনাচক্রে রেবতীর ওপরেই দুজনের ইচ্ছাপূরণ নির্ভর করছে—দুজনের দুরকমের ইচ্ছা। এ-লড়াই আরও ঘোরালো করার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নীলাকে কুমারী করে রাখেন নি। আগে তার বিয়ে হয়েছিল, এখন সে বিধবা। অর্থাৎ মায়ের কাছে থাকলেও খাওয়া-পরার জন্যে তাকে মায়ের ওপর ভরসা করতে হয় না। স্বামীর দত্ত অংশের টাকা সে যেমন খুশি খরচ করতে পারে। উইলের প্রোবেট নেওয়ার জন্যেও সে তৈরি

হচ্ছে। সোহিনীর হাতে টাকা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নেই। তার ভরসা ছিল রেবতীর ওপর—সে যদি মন দিয়ে কাজ করে। কিন্তু নীলার অস্ত্র তার 'উন্মত্ত যৌবন'। মনের ভেতরে ঢুকে চুরি করে নিয়ে যায় রেবতীকে। কী করবে পানজাবি দারোয়ান? 'ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরে ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।' অসম যুদ্ধ। সোহিনীর অস্ত্র ব্যুমেরাঙ হয়ে গেছে।

শুধু মা-মেয়ের লড়াই নিয়েই "ল্যাবরেটরি" এক আশ্চর্য গল্প হতে পারত। তবু পিসিমাকে আনা কেন? কেন রেবতী কচ হতে পারে না? এইখানেই রবীন্দ্রনাথের দেশকাল-সচেতন বাস্তবতার পরিণত প্রকাশ। এইখানেই পিসিমার আসল ভূমিকা।

ছেলেবেলা থেকেই রেবতীর শিক্ষা: মেয়ে দেখলে চোখ নামিয়ে নেওয়া। 'যে সুন্দরী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেখেছে পিসির তর্জনী। তাই যখন সুযোগ ঘটে তখন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।' এর ফল বড়ো মারাত্মক। অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে। নীলার কাছে 'আসল দামী জিনিস ভালোবাসা'র আশ্বাস পেয়েও তার অস্বস্তি কাটে না। সোহিনী আর নীলার মুখোমুখি লড়াইয়ে মধ্যে পড়ে যতই 'বুক ফুলিয়ে' কথা বলুক, পিসিমা তার অনেক নিরাপদ আশ্রয়। আশৈশব সেটাই তার চেনা। রেবতী যে পিসিমার ডাক গ্রাহ্য না-করে পারে না—এই তো পিসিমার সত্যিকারের কীর্তি। রেবতীকে তিনি স্বাশ্রয়ী হতে দেন নি।

এ-ও 'রীতিমত মেয়ে'র যোগ্য কাজ। রেবতীকে ধিক্কার দেওয়া সহজ, কিন্তু এমন পিসিমার হাতে যে মানুষ হয়েছে সে কি আর আলাদা কিছু হবে? অচিরা বা সহু যদি তৈরিও হয়, পিসিমারা তো থেকেই যান। সোহিনীও জানত সে কথা। কিন্তু বাঙালি পিসিমার জোর কত বেশি তা সে বোঝে নি, পানজাবি মেয়ে বলেই বোধহয় আন্দাজে আসে নি। এই পিসিমার কাছে এমনকী নীলাও হেরে যায়। "ল্যাবরেটরি"র আগে, বাঙালি গৃহস্থবাড়ির এই প্রবলপ্রতাপান্বিতা কর্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথ কখনও এত স্পষ্ট করে হাজির করেন নি। যেমন হাজির করেন নি নীলার মতো চরিত্র—যার 'যৌবনের আঁচ' বিদুষী শিক্ষিকারও মনে লাগত, 'তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্ত বাষ্পে'। স্ত্রী-সমকামিতার এই ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ এর আগে বা পরে আর কখনও দেন নি।

চরিত্র হিসেবে রেবতী বেচারা গোড়া থেকেই প্রতিবন্ধী। ছেলেটি সোহিনীর পছন্দসই বটে, কিন্তু প্রথম চাক্ষুষ করার পরেই তার খটকা লাগে। তাকে সশরীরে হাজির করার আগেই সাবধান করে দেওয়া থাকে: মায়ের দুলাল এই ভাইপোর হাড় পাকে নি। তার চেহারা-বর্ণনাতেও সেই দিকটার ওপরেই জোর পড়ে। ছেলেটির চোখে 'দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো জ্বলজ্বল করছে', কিন্তু 'নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম।' পরেও রবীন্দ্রনাথ বলেন তার মেয়েলি মুখ লাল হয়ে ওঠার কথা। সোহিনী তার সম্পর্কে যত খবর জোগাড় করেছে তার মধ্যে সে বিশেষ করে লক্ষ করে একটা কথা: 'ছেলেবেলার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কান্নাকাটি-জড়ানো সেন্টিমেনটাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা দুর্বল মাধুর্য ছিল, তাতে পুরুষ বালকদেরও মনে মোহ আনতে পারত।' সোহিনী তাকে দেখে বুঝেছিল: রেবতীর মধ্যে 'পৌরুষের ম্যাগনেটিজম' নেই। আসলে সে চুম্বক নয়, লোহা।

জ্ঞানে প্রৌঢ় আচারে অপরিণত এই ছেলেটি জাগতিক অর্থে মানুষ হতে শুরু করে নীলার সংস্পর্শে এসে। পাণ্ডিত্যের চাপে ফিকে-হয়ে-যাওয়া পৌরুষ প্রথম জেগে ওঠে। জাগানী সভায় এসে যেন তার নবজন্ম হয়। শরীরটাকে নিয়ে তখনও হয়তো 'আঁকুবাঁকু' করে, তবু 'ওর পৌরুষ সম্বন্ধে সংশয়মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বসল।' 'জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমানুষ বানিয়ে তুলছে।' নীলাও সেই আঁচে হাওয়া দেয়: 'আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ।' কিন্তু নীলা যখন রাত-কাপড় পরে হঠাৎ ল্যাবরেটরিতে ঢোকে, রেবতী কথা বলে 'গদ্‌গদ কণ্ঠে' উত্তর দেয় 'বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে'। অবশ্য সোহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে নীলার ভরসায় সে 'বুক ফুলিয়ে' কথা বলতে পারে, কিন্তু পিসিমার কাছে আর শেষ রক্ষাটা হয় না।

রেবতী কখনোই লেখকের-সহানুভূতি-পাওয়া চরিত্র নয়। অধ্যাপক চৌধুরী বলেছিলেন, 'ওর আর সবই আছে কেবল বুদ্ধি নেই। অভাব ততটা বুদ্ধির নয়, যতটা পৌরুষের। বারুদের কারখানায় বেচারা অ্যাপ্রেনটিসি' শুরুই করে নি। জাগানী সভায় বসে তার মনে হয়: 'এতদিন সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রজাপতি বেরিয়ে পড়েছে।' পিসিমার ডাক শুনে, ডানা মেলার আগেই, সে-প্রজাপতি আবার গুটিতে ঢুকে যায়।

শুধু নিজের পৌরুষের অভাবেই রেবতীর চরিত্র অত খাটো হয় না। নন্দকিশোরের কথা এতবার ঘুরে-ঘুরে আসে যে তাঁর তুলনায় তাকে আরও ছোটো বলে মনে হয়। নন্দকিশোরের কাছে হার মেনেছিল সোহিনীর মতো মেয়ে। আর রেবতী? 'ল্যাবরেটরির দ্বারের বাইরে দিনরাত পাহারা চলছে, ভিতরের ভাঙা কাজ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই।'

"ছোটো গল্প" তথা "শেষ কথা"য় বেশ বড়ো একটা আলোচনা ছিল এই সমস্যা নিয়ে: মেয়েরা কি পুরুষকে শক্তি দিতে পারে? অচিরা বলেছিল, 'হ্যাঁ, শক্তি দেব, যদি নিজেকেই মোহ জড়িয়ে না ধরে।' পুরুষের মধ্যে থাকা চাই অপরাজেয় চিত্তশক্তি, সেই শক্তি যা এড়াতে পারে প্রবৃত্তির টান। ভেতরে এ জিনিস না থাকলে তার দশা হবে রেবতীর মতো। "ল্যাবরেটরি"তে চৌধুরী বলার চেষ্টা করেছিলেন, 'কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে কেন, যে, মেয়েরা পুরুষের ইন্‌স্পিরেশন জাগাতে [জোগাতে?] পারে।' উত্তরে সোহিনী বলেছিল, 'আমার সবই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিষ পর্যন্ত ভালোই চলে, কিন্তু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।'

আশি বছরে পা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কি শেষে এই সিদ্ধান্তেই এলেন? পুরুষকে হতে হবে স্বনির্ভর, প্রেরণার ভরসায় না থেকে বিদ্যা বা কর্মের জগতে লক্ষ্য স্থির রেখে এগোতে হবে। যা-কিছু পথভ্রষ্ট করতে পারে তাকে পেরিয়ে যাওয়াই তার পরীক্ষা। মেয়েরা বারেবারে সে-যাত্রায় বাধা হয়েছে নানা রূপে: কখনও পিসিমার মতো তর্জনী উঁচিয়ে, কখনও নীলার মতো মোহজাল বিছিয়ে। রবীন্দ্রনাথ চাইছেন: বাঙালি মেয়েরা পুরুষকে দখল করার মনোভাব ছাড়ুক, চিনে নিক নিজের কাজের জগৎ, বাঙালি পুরুষ মুক্তি পাক। সে-জগৎ অচিরাও খুঁজে পায় নি, এক 'ইম্পার্সোনাল ভালোবাসার আদর্শ'ই তার সম্বল। সোহিনী কিন্তু পেয়েছে (মনে রাখা চাই, সে আসলে পানজাবি। এমনধারা প্রথা-ভাঙা বাঙালিমেয়ে কল্পনা করতে রবীন্দ্রনাথের বাস্তববুদ্ধি রাজি হয় নি)। বহু চেষ্টায়, বহু সাধনায় ব্যক্তিক আবেগকে সংবৃত-সংযত করে সে যোগ দিতে পেরেছে নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানের সাধনায়।

বাঙালি সমাজে স্ত্রী-পুরুষের ভূমিকা নিয়ে একবার তর্ক উঠেছিল পঞ্চভূতের সভায়। গাড়ি ধরতে দৌড়োনোর আগে শেষ কথা বলেছিল ক্ষিতি: '...সহজ প্রবৃত্তি, যাহাকে ইংরেজিতে ইন্‌স্টিংক্‌ট্ বলে, তাহার ভালো আছে, মন্দও আছে। বুদ্ধির দুর্বলতার সংযোগে এই সমস্ত অন্ধ প্রবৃত্তি কত ঘরে কত অসহ্য দুঃখ, কত দারুণ সর্বনাশ ঘটায় সে কথা কি দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর অসাক্ষাতেও বলা চলিবে না। দেশের বক্ষে মেয়েদের স্থান বটে, সেই বক্ষে তাহারা মূঢ়তার যে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া রাখিয়াছে, সেটাকে সুদ্ধ দেশকে

টানিয়া তুলিতে পারিবে কি। তুমি বলিবে, সেটার কারণ অশিক্ষা। শুধু অশিক্ষা নয়, অতি মাত্রায় হৃদয়ালুতা।...'[৮]

এই কথাগুলোই শরীরী হয়ে ওঠে পিসিমার মধ্যে। "নরনারী" লেখার আটচল্লিশ বছর বাদে, পিসিমার পাশাপাশি সোহিনীকে সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ যেন সেই তর্কের পালা চুকিয়ে দিলেন।

টীকা

১. 'চিঠিপত্র' ৯ (১১ জুন ১৯৩৭)। 'গল্পগুচ্ছ', চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৮২, পৃ ১০০৪-এ উদ্ধৃত। "ল্যাবরেটরি" ও অন্যান্য গল্পের থেকে সব উদ্ধৃতিই এই সংস্করণ থেকে।

২. ঐ।

৩. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'কিসের ল্যাবরেটরি? মনে হয় ফিজিক্সের। কিন্তু কী আসে যায় তাতে?' ('কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ', কলকাতা : বাক্‌সাহিত্য, ১৩৭৩, পৃ ৮৩)। আসলে নন্দকিশোরের এ ল্যাবরেটরি প্রায় ফাউস্ট-এর মতো : পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা সবেরই ব্যবস্থা আছে। রেবতীর গবেষণা ম্যাগনেটিজম নিয়ে। সারা গল্পে এই ম্যাগনেটিজম-এর কথা ঘুরে-ফিরে বারবার আসে, আর তার ফলে একটা রূপক-তাৎপর্যও পায়।

৪. এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই হাজির করা যায় গোরা ('গোরা') ও শচীশকে ('চতুরঙ্গ')। কিন্তু তারাও রবীন্দ্রনাথের ঈপ্সিত চিন্তার ফল। শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখের সামনে থাকে রেবতীর মতো ছেলেই।

৫. রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, "পুরাণের পুনর্ব্যবহার : 'বিদায়-অভিশাপ' থেকে 'শেষ কথা', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৮৪ দ্র।

৬. 'মহাভারত', আরণ্যকপর্ব, খণ্ড ৪, অংশ ২, প্রামাণিক সংস্করণ, পুনা : ভাণ্ডারকর ওরিএণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট, ১৯৪২, পৃ. ১০০১-২ ও 'রামায়ণ', বালকাণ্ড, খণ্ড ১, প্রামাণিক সংস্করণ, বরোদা : ওরিএণ্টাল ইন্‌স্টিট্যুট, ১৯৬০, পৃ ৪৩৭-৩৮-এ ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের বিভিন্ন উৎসের তালিকা ও সে-বিষয়ে হাইনরিশ লুডর্স-এর আলোচনার সারাংশ দেওয়া আছে। কাহিনীটির জৈন রূপভেদ পাওয়া যায় হেমচন্দ্রের 'ত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত'-এর পরিশিষ্টপর্ব 'স্থবিরাবলীচরিত', ১।২২-২৫৮-য় (হেরমান ইআকবি-সম্পা, কলকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৩২)। চীন ও জাপানেও গল্পটি সুপরিচিত ছিল (মরিস ভিন্‌টারনিৎস, 'আ হিস্ট্রি অব ইন্‌ডিআন লিটরেচর', প্রথম খণ্ড, দিল্লী : মোতিলাল বনারসীদাস, দাস, ১৯৮১, পৃ ৩৮৭ টীকা ২ ; আর্নেস্ট জে. আইটেল, 'হ্যন্ড-বুক অব চাইনিজ বুদ্ধিজম', লন্ডন : ট্রুবনার, ১৮৮৮, পৃ ৫৬ দ্র)। ইংরিজি ও জার্মান ভাষাতেও এ নিয়ে গল্প, নাটক ইত্যাদি লেখা হয়েছে (ভিন্‌টারনিৎস, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৮৪ টীকা ৪)।

৭. মহাভারত, প্রামাণিক সংস্করণ, আরণ্যকপর্ব, অধ্যায় ১১০-১১২ ; কালীপ্রসন্ন সিংহ, বনপর্ব, তদেব ; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ, ঐ, অধ্যায় ৯৩-৯৪।

৮. 'পঞ্চভূত', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫৫, পৃ ৪১।

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

করুণাময় মুখোপাধ্যায়
(বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক)

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে দীর্ঘ সময় ধরে কৃষকপ্রজা ও গ্রামবাসীর দারিদ্র্য, দুঃখ, দেনা, অশিক্ষা, ভীরুতা, অসহায়তা এবং নিশ্চেষ্টতা ইত্যাদি নিজ চোখে দেখেছেন, দরদ দিয়ে বুঝেছেন, অন্তরের সহানুভূতির আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এসবের প্রতিকারের পথ কী—তা নিজস্ব পদ্ধতিতে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন। জমিদারের স্বত্ব-ও উপস্বত্ব-ভোগ এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা তিনি অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে, পল্লীর ও কৃষকপ্রজাদের উন্নতির উদ্যোগ-আয়োজন এবং গঠনমূলক কল্যাণকর্মে তিনি সর্বোপায়ে আত্ম-নিয়োগ করেছেন। সমালোচকের পক্ষে জমিদার রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে তখনকার সমকালীন অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত। দেশের মধ্যে অসম ধনবণ্টন, অভিজাত সম্প্রদায়ের আনন্দসম্ভোগের বিরাট আয়োজন এবং শতধা-বিচ্ছিন্ন সমাজ দেখেশুনে রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক লজ্জা অনুভব করে এই পরিস্থিতির নিন্দা করেছেন।

অনেকের ধারণা, রাশিয়ায় যাবার পরেই জমিদারির আয়ে পরগাছা-জীবনের ও প্রজাশোষণের গ্লানি রবীন্দ্রনাথকে প্রগতিশীল—এমনকী "বিপ্লবী" মানুষ করে তুলেছিল। কিন্তু ভুললে চলবে না—১৯২০-১৯২৬ সালে "রায়তের কথা" প্রবন্ধের ভূমিকায় অন্যান্য কথার মধ্যে লিখেছিলেন, 'আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব' ইত্যাদি। এই গ্লানি, এই লজ্জাবোধ থেকে অবশেষে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন, সম্ভবত যখন তাঁর গ্রন্থাবলীর বিক্রয়লব্ধ অর্থে নিজের জীবিকা উপার্জন সম্ভব হয়েছিল। অধিকন্তু, আমাদের মনে রাখা উচিত যে, গ্রন্থাবলীর স্বত্ব থেকে পুত্র ও পরিবারবর্গকে বঞ্চিত করে তিনি বিশ্বভারতীকে দান করে যান।

১

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তার একটা বৃহৎ দিগন্ত বিধৃত ছিল এবং এর একটা বড়ো অংশ আবর্তিত হয়েছিল প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন, জমি) এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানাকে কেন্দ্র করে। তাঁর জীবনের আদিপর্বে জমিদারের জমিদারির স্বত্বের অধিকার ও সম্ভোগ, জমিদার-প্রজা সম্পর্ক এবং জমির খাজনা ও প্রজাস্বত্ব ইত্যাদি বিষয়কে বেষ্টন করে তাঁর চিন্তার উন্মেষ হয়েছিল, কর্মপদ্ধতির উপর তার প্রভাবও পড়েছিল। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ধীরে-ধীরে তাঁর মত এবং দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন, ১৮৯০-১৯০৪ সালের জমিদার রবীন্দ্রনাথ, এবং পরবর্তী সময়ে, যথা ১৯০৫-১৯১৪ এবং ১৯২০-৩০ ও ১৯৩০-৪০ দশকের জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠিক এক ব্যক্তি নন।

১৮৯০ সালে ২৯ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ পিতার এজমালি বিস্তৃত জমিদারির তত্ত্বাবধানের ভার পেলেন। মধ্য ও উত্তরবঙ্গের জমিদারিতে তিনটি পরগনা ছিল, যথাক্রমে—(১) নদীয়া জেলায় বিরাহিমপুর পরগনা, যার কাছারি ছিল কুষ্টিয়া মহকুমার শিলাইদহে; (২) পাবনা জেলায় সাহাজাদপুর পরগনা, কাছারি ছিল সাহাজাদপুর গ্রামে; (৩) রাজশাহী জেলায় কালীগ্রাম পরগনা, কাছারি ছিল পতিসরে। কলকাতায় পিতার জোড়াসাঁকোর বিশাল অট্টালিকায় বিরাট যৌথ পরিবারে নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যাকে রেখে রবীন্দ্রনাথ তখন একাই মফসলে থাকেন জমিদারির কাজে। একাধারে ভাবালু কবি-মানুষ রবীন্দ্রনাথ এবং কমিউনিসট-জমিদার রবীন্দ্রনাথ,—এই দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তির তখনকার মনোভাব লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর অন্তর জুড়ে রয়েছে তখন এক অভিনব অভিজ্ঞতা, নতুন এক রোমানটিক অনুভব। এই অনুভূতির বিমিশ্র আনন্দকৌতুকরস "ছিন্নপত্র"-র পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় বিধৃত হয়ে রয়েছে। সাজাদপুর, রবিবার, ২০শে মাঘ ১২৯৭ তারিখের একটি পত্রে কবি লিখছেন (দ্রষ্টব্য, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, র.র, ১১ খণ্ড, পৃ ২৫, কলিকাতা) তরা ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ সালে: 'প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। ...আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তাহলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত। সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই রোমানটিক অনুভূতি আর দরদি মনোভাবের কারণ সহজেই অনুমেয়। পদ্মাপারের উদার শ্যামল প্রকৃতি একদিকে যেমন নগরপালিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে মযূরের মতো নৃত্যপর করে দিয়েছিল, অন্যদিকে দরিদ্র মূঢ় ম্লানমুখ প্রজাদের মধ্যে অবিরত চলাফেরা করতে-করতে নানা ঘটনার সংঘাত তাঁর আত্মিক উন্মোচন ঘটিয়েছিল। হতে পারে এটা তাৎক্ষণিক; কেননা, যে-ব্যক্তি তখনকার সময়ে জমিদারি আর সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছেন, যে-ব্যক্তি তখনকার দিনে কঠোর নিয়মে খাজনা আদায় করছেন, কিস্তি খেলাপ হলে জরিমানা করছেন, "পুণ্যাহ"-র নামে ভেট নজরানা আদায় করছেন, বেগার উপঢৌকন আবওয়াব ইত্যাদি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, গ্রহণ করছেন, এবং হয়তো বা খোলাখুলি প্রতিবাদ কিংবা প্রত্যাখ্যান করছেন না, তখন নিম্নলিখিত পত্রটির বিষয়গত অনুভব কারও-কারও কাছে কার্যত অসার মনে হতে পারে; শুধু বাক্যের ঐশ্বর্য এবং ভাববিলাস বলে ঠেকতে পারে। ১১ মে, ১৮৯৩ শিলাইদহ থেকে হিমালয় প্রদেশের সিমলায় ভাইঝি ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন (দ্রষ্টব্য: জন্মশতবার্ষিকী র-র, ১১ খণ্ড পৃ ১০৭): 'আমার এই চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়।'

সমালোচনা হতে পারে যে, এই পর্যায়ে আধা-ফিউডাল গণ্ডি ভেঙে কেন তিনি বার হন নি। কিন্তু মনে রাখা উচিত, পরিবর্তন কোনো বিষয়ে একদিনে হয় না; পরিবর্তন সময়- আর অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সকলেরই, সব মানুষেরই, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বাস আর প্রতীতি বদলায়, অতীত দিনের চিন্তার ওপর নতুন চিন্তার প্রলেপ পড়ে। বরং, এখানে এই সঙ্গত প্রশ্নটি রাখা যাক—এ কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে যে, এই আদিপর্বেই তিনি প্রজাদের ওপর অত্যাচার করলে কর্মচারীদের ক্ষমা করতেন না? শুধু তাই নয়, এমনও ঘটেছে যে, প্রবীণ অভিজ্ঞ কর্মচারীদের অনেককে তিনি প্রজাপীড়নের জন্য বরখাস্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি। (দ্র. প্র. কু. মু. র. জী. ১ম খণ্ড, পৃ ২৮৫ এবং শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, "শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ" পৃ ২৯)।

অপিচ, রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার হয়েও ১৮৯৮ সালে তৎকালীন জমিদার-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যা লিখেছিলেন তাতে তাঁর সংসাহসের প্রশংসা করতে হয়, এবং ঔদার্যের প্রশস্তি গাইতে হয়। ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের (১৮৯৮) "ভারতী" পত্রিকায় অসহিষ্ণু বিদ্রোহীর সুরে বিনা দ্বিধায় লিখলেন তাঁর 'মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে' প্রবন্ধ। সেকালের উত্তর-পাড়ার ইংরেজ-রাজ-ভক্ত "রাজা" উপাধিধারী বিরাট জমিদার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন —রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসপন্থী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা দেশের আসল নেতা নন; জমিদার-সম্প্রদায়ই হল দেশের 'স্যাচারাল লীডার'। রবীন্দ্রনাথ সুতীব্র ভাষায় এই দাবির সরাসরি চ্যালেনজ করে লিখলেন: 'বর্তমানের জমিদারগণ নিজ গৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্য দ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন।...ইহারা কুম্মাণ্ডলতার ন্যায় একমাত্র গবরমেনটের আশ্রয়-যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন, ভুলিয়া যান যে সেই রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুল্মসমাজের খর্বতা শ্রেয় এবং তৃণসমাজের নম্রতা শোভন।'... 'এদেশে পূর্বকালে জমিদার সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল, তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না; তাহা দান, অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদারগণ প্রতিদিন হারাইতেছেন।' (ভারতী, ১৩০৫, পৃ ৪৩১। অপিচ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় র. জী. ১ম খণ্ড, ১৩৫৩ সং, পৃ ৩৫২)।

১৯০৪ সালে ২২শে জুলাই তখনকার 'স্বদেশী' আন্দোলনের সময় নিজ জমিদারির আয়ভোগ করতে থাকলেও তাঁর 'স্বদেশী সমাজ'-শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একজন প্রগতিশীল জমিদাররূপে প্রজাকল্যাণ ও পল্লী-উন্নয়ন-কার্যে নিযুক্ত রয়েছেন দেখে মনে হয়, এরকম জমিদার সেকালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিশেষ তেমন কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁর নিজের সমাজচেতনা, ইতিহাসের জ্ঞান এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মিশ্র পরিণতি ছিল তাঁর স্বদেশচিন্তা। স্বনির্ভর পল্লীর সামগ্রিক উন্নতির কর্মপ্রণালী তিনি যা অনুসরণ করেছিলেন তার আলোচনা এই লেখক অন্যত্র করেছেন (চতুরঙ্গ, মে, ১৯৮৮)। এখানে তার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

২

'স্বদেশী সমাজ' লেখবার পর থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাই—তিনি চিন্তা করেছেন বহু মূল সমস্যা নিয়ে। দেশের ধনী এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বা দরিদ্রলোকের মধ্যে ধনবণ্টন এবং আনন্দসম্ভোগ প্রভৃতি ব্যাপারে যে ব্যবধান রয়েছে, তা দেশকে শতধা-বিচ্ছিন্ন করছে দেখে ১৩১১ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় 'উৎসবের দিন' নামক প্রকাশিত ভাষণে এইসব সমস্যার আলোচনা করলেন: 'আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর, খাদ্য প্রচুরতর, আয়োজন

বিচিত্রতর হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা, আমাদের দীনতা, আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা।' (দ্রষ্টব্য ধর্ম, শতবার্ষিকী র. র., ১৩ খণ্ড। অপিচ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, র. জী. ১৩৮৩, ইং ১৯৭৭ সং, পৃ ১৫০, পাদটীকা-২)

১৩১২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে "ভাণ্ডার" পত্রিকায় 'বিলাসের ফাঁস' প্রবন্ধে প্রাচীন সমাজের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'যে ধন দেশের বিচিত্র অভাব মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে, তাহা সত্য নহে।' 'সমস্ত শরীরটাকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত-সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে, বন্ধুস্থানকে, জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগ-স্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে বাহির হইতে মনে হয়, যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্যই এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।' (দ্রষ্টব্য, প্র. কু. মু. ১৯৭৭, পৃ ১৭৮)।

এই প্রবন্ধের প্রায় এক বছর আগে 'স্বদেশী সমাজ' লেখার পর গ্রামের সমস্যা নিয়ে যে কর্ম-প্রণালী রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জমিদারিতে বাস্তবে রূপায়িত করলেন, তার কথা আমি অন্যত্র উল্লেখ করেছি (চতুরঙ্গ, তদেব)। পতিসরে সমবায়-কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্পর্কে আর দু-একটা কথা যোগ করলে আমরা তাঁর প্রজাদরদি প্রগতিমূলক দৃষ্টির পরিচয় আর-একটু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাব। নোবেল প্রাইজ পাবার (১৩ই নভেমবর, ১৯১৩) পর রবীন্দ্রনাথ এর অর্থমূল্য (তখনকার) এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা কোনো স্থায়ী নামকরা ব্যাঙ্কে উচ্চ-সুদে গচ্ছিত না রেখে ১৯১৪ সালে পতিসর কৃষি-ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ায় যখন লোকে প্রশ্ন করল—এ কাজ তিনি কেন করলেন, অর্থাৎ এই ঝুঁকি কেন নিলেন, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'গ্রামের উন্নতির জন্য চাষী কোথায় টাকা পাইবে। তাঁহার ধনে তাঁহার পরিবারের লোকের যেমন দাবি, তাঁহার প্রজাদের দাবি তাহা হইতে কম নহে।' (দ্রষ্টব্য : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, র. জী. ১৩৫৫, ২য় খণ্ড, পৃ ৩৫২)। অবশ্য কয়েক বছর পরে ওই ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় 'ঝুঁকি' নেবার ফল টের পেলেন রবীন্দ্রনাথ।

প্রাসঙ্গিকতা মনে রেখে এখানে বলা চলে যে, প্রায় সাত বছর আগে ১৯০৭ সালে পাবনা প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভার সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ জমিদার-দের আহ্বান জানিয়ে প্রজা-উৎপীড়ন বন্ধ করে প্রজা-কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে সোজাসুজি উপদেশ দেন। (দ্রষ্টব্য. শতবর্ষ সং, র. র. ১২খণ্ড, পৃ ৮২২-২৪)। বলা বাহুল্য, এই ভাবটি বীজাকারে লুকিয়ে ছিল তাঁর মনে, যা অবারিত হয়েছিল তাঁর ১৯০৮ সালে লিখিত "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে। এখানে ভিন্ন পরিবেশে অন্য প্রসঙ্গে কবি যা বলেছিলেন তা এই যে, জমিদারের সম্পত্তি শুধু যেমন জমিদারের নয়, তাতে প্রজারও দাবি আছে, তেমনি দেশের সম্পদে রাজা আর প্রজা বা রাষ্ট্র আর নাগরিক ব্যক্তির যৌথ অধিকার আছে। রাজ্যটা কেবল রাজার নয়। (অপ্রাসঙ্গিক হয়তো হবে না, যদি বলা যায় যে, এই বক্তব্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের নিশ্চয়ই ভালো লাগে নি। অন্যান্য কথাও এই প্রসঙ্গে ওঠা স্বাভাবিক, যা আমরা এখানে আলোচনা করতে অনিচ্ছুক)। ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে কবি রাজদ্রোহের বাণী শোনালেন : 'সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক প্রজার নয় তো কী?'

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের বিষয়বস্তু এইরকম : যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের দরবারে যাবার পথে প্রজাদলকে হাতিয়ার রেখে শূন্য হাতে যেতে বলে বৈরাগী বলল, আমরা খাজনা দেব না। তারপর যথাস্থানে পৌঁছালে প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করলেন ধনঞ্জয়কে—তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয় : খেপিয়েছি বৈ-কি!…

প্রতাপাদিত্য : মাধবপুরের প্রায় দু বছরের খাজনা বাকি—দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয় : না মহারাজ, দেব না।…যা তোমার নয়, তা তোমাকে দিতে পারব না,…আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

প্রতাপাদিত্য : তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয় : হাঁ, মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি।

প্রতাপাদিত্য (প্রজাদের) : তোরা মাধবপুরে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এখানেই রইলে।

প্রজাগণ : আমাদের প্রাণ থাকতে সে তো হবে না। ধনঞ্জয়কে গারদে আবদ্ধ করার পর, দৃশ্যান্তরে : মাধবপুরের প্রজাদলকে (উচ্চৈঃস্বরে) আমরা এখানে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকব।…আমরা এখানে না খেয়ে মরব…ইত্যাদি বলতে শুনি।

এখানে রাজা-প্রজার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে-বিপ্লবী মনোভাব কবি তাঁর "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রকাশ করলেন ১৯০৮ সালে, তারই পরিপূরক মনো-ভাব নিয়ে সমাজের কুসংস্কার ও গতিহীন যন্ত্রবৎ জীবন-যাপনের গ্লানি ও যুক্তিহীন ধার্মিকতার জঞ্জাল সরাবার আহ্বান জানালেন ১৯১১ সালে, অর্থাৎ এর তিন বছর পরে। আমরা দেখি ১৫ আষাঢ় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে লিখিত "অচলায়তন" নাটকে এই মনোভাবই প্রকাশ পেল। পুরানো সমাজকে না ভেঙে তার সংস্কার এবং কর্ম ও যৌবন-শক্তির গতিবেগ সঞ্চার করাই ছিল 'পঞ্চক'-এর জটিল চরিত্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।

প্রজা-দরদি রবীন্দ্রনাথ ১৯২২ সালে (৪ঠা মাঘ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে) রাজা-প্রজা সম্পর্ক নিয়ে বিদ্রোহী প্রজার নেতৃত্বে বসিয়ে ধনঞ্জয় বৈরাগীকে আবার একবার সৃষ্টি করলেন "মুক্তধারা" নাটকে। উত্তরকূট পার্বত্য-প্রদেশের রাজা রণজিৎ তাঁর সভার যন্ত্রশিল্পী বিভূতিকে দিয়ে পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ গেঁথে তুলে মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধে শিবতরাই-এর দুর্ধর্ষ প্রজাদের জল সরবরাহ বন্ধ করায় তাদের জলকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট দেখা দিল। দু বছর খাজনা বাকি। তারা রাজার খাজনা দেবে কী করে? দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করবেই বা কেন? খাজনা বন্ধ হল, তাই রাজস্ব ঘাটতি। যুবরাজ অভিজিৎকে রাজা সরিয়ে আনলেন। এখানেও সেই একই প্রতিবাদ উচ্চারিত : রাজত্ব একা রাজার নয়, প্রজারও। প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে নো-রেন্ট্ ক্যামপেন বা খাজনা-বন্ধের সত্যাগ্রহ করল। (দ্রষ্টব্য : শতবার্ষিকী ৬ খণ্ড, পৃ ৬২৫-২৬)।

সত্যাগ্রহের পথপ্রদর্শক গান্ধীজীর অহিংস প্রতি-রোধ আন্দোলন যখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মুখো-মুখি দাঁড়িয়েছে, সেই সন্ধিক্ষণে "মুক্তধারা" নাটক রাজার নির্মম অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে—এমন অনুমান অসঙ্গত হবে কিনা—তা ইতিহাসবেত্তারা এবং অন্যান্য সমালোচকগণ বিচার-বিবেচনা করবেন।

এই "মুক্তধারা" নাটক লেখবার মাত্র প্রায় আড়াই মাস আগে (১৮ই কার্তিক ১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ ইতঃপূর্বে তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে জমিদারি ও জমিদারের সম্পর্কে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তার উল্লেখ করে অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখলেন—'…যাঁরা বাংলা-দেশের জমিদার তাঁরা যতক্ষণ সদর খাজনা যুগিয়ে নিজের জীবিকা ও আরামের সংস্থান করতে চান, ততক্ষণ অন্য লোককে ত্যাগস্বীকার করতে বলতেই পারেন না।…বাংলাদেশে জমিদারের চেয়ে গবর্মেনটের বড়ো কর্মচারী আর কেউ আছে।' (চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮৭, ১৮ই কার্তিক ১৩২৮। অপিচ দ্রষ্টব্য, প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়, ৩ খণ্ড, পৃ ১৮৫ পাদটীকা)। বলা বাহুল্য, তখনকার কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় জমিদারদের এই শ্লেষপূর্ণ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের সত্যকথা বলবার সৎ সাহস প্রকাশ করেছে।

৩

১৯২৬ সালে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর "রায়তের কথা"র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই।···আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।···প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়।···এমন জমিদারি ছেড়ে দিলেই তো হয়? কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে?···প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে-দেখতে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে জমি যদি পণ্য-দ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে,··· অভাবের তাড়নায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চলবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই। ···রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই।··· নিজেকে রক্ষা করতে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। রায়ত খাদক। রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে।···জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মোকদ্দমা ঘর জ্বালানো, ফসল-তছরূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই।·· দুর্বল রায়তের ছোটো-ছোটো জমি ছলে-বলে-কৌশলে আত্মসাৎ করে প্রবল রায়ত ক্রমে জমিদার হয়ে উঠতে থাকে।'

এখানে প্রাসঙ্গিক একটা মন্তব্য এই লেখক রাখতে ইচ্ছুক : এই-যে জমি-হস্তান্তরের অধিকার থাকার ফলে ছোটো রায়তের ক্রমবর্ধমান জমিহীনতা এবং বড়ো রায়ত অর্থাৎ জোতদারদের উৎপত্তি—এই ঐতিহাসিক মর্মান্তিক সত্য যেভাবে রবীন্দ্রনাথ ১৯২৪-৩০ দশকে স্বয়ং বর্ণনা আর বিশ্লেষণ করেছেন, তা প্রতিষ্ঠিত গবেষককেও হার মানায়। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ সংখ্যাগত পর্যায়ে দেখান নি—ক্রমপর্যায়ে কত পরিমাণে অথবা কী হারে ছোটো রায়তদের জমি আত্মসাৎ করে বড়ো রায়ত-গোষ্ঠী ফুলে-ফেঁপে নিজেরাই ছোটো জমিদারে পরিণত হয়েছিল। কবির বর্ণনা ও বিশ্লেষণের পরিপূরক হিসাবে বর্তমান লেখক নিজের গবেষণালব্ধ কিছু সংখ্যাগত তথ্য নীচে দিচ্ছেন :

বিক্রেতা ও ক্রেতা রায়তদের হিসাব

এই রায়তদের নাম স্থিতিবান/দখলস্বত্বাধিকারী রায়ত/ইংরেজি নাম Settled/Occupancy Raiyats (অথবা Ryots—একই অর্থে)। বক্তব্য এই যে, স্থিতিবান/দখলস্বত্বাধিকারী ছোটো রায়তরা অভাবের তাড়নায় অথবা/এবং অন্যান্য নানা চাপে বা কষ্টে পড়ে ১৮৮১-১৮৮২ সাল থেকে ১৯০৫-১৯০৬ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ এই মোট পঁচিশ বছর সময়সীমার মধ্যে মোট ৫৩৬০৭২৩ একর (তিন স্ট্যানডার্ড বিঘা=এক একর) জমি বিক্রি করেছিল, তার মধ্যে যেসব জমি বড়ো রায়তরা কিনেছিল বা কুক্ষিগত করেছিল নানা অসাধু উপায়ে, তার পরিমাণ ছিল মোট ২৩৬৬৮৮৮ একর জমি, অর্থাৎ মোট বিক্রীত জমির শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগেরও কিছু বেশি। এই পরিমাণ জমি দখলে নিয়ে তারা কিছুটা নিজের খাস প্রয়োজনে রেখে বাকি জমি 'বর্গা' অর্থাৎ ভাগচাষে এবং/অথবা 'কোর্ফা' রায়তি স্বত্বে বিলির বন্দোবস্ত করেছিল। বাহুল্য মনে হওয়ায় এবং বিশেষত স্থানাভাববশত এ-বিষয়ে কোনো হিসাব এখানে দেওয়া হল না।

কবি আরও বলেছেন : 'আমি জানি জমিদার নির্লোভ নয়।···কিন্তু চাষীর জমি সরে-সরে মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে তাতে জমিদারের লোকসান আছে (কিন্তু) চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশি কড়া।'

'জমির চাষ করে যে,—জমি তারই হওয়া উচিত' —প্রমথ চৌধুরীর এই মন্তব্য তখনকার দিনে বেশ

প্রগতিশীল ছিল। কিন্তু ছোটো রায়তের জমি হস্তচ্যুত হবার ভয় থেকে তাদের রক্ষা করা সহজ নয়—এই কথাটা রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন। (উৎস : "রায়তের কথা" প্রমথ চৌধুরী বিশ্বভারতী,'বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ'। "রায়তের কথা"র রবীন্দ্রনাথের 'ভূমিকা' পৃ. ১-১৩, এবং প্রমথ চৌধুরীর 'টীকা' পৃ. ১৪-২৪, একই সঙ্গে আষাঢ় ১৩৩৩ (১৯২৬) "সবুজপত্র"-তে প্রকাশিত হয়েছিল। অপিচ দ্রষ্টব্য প্রমথ চৌধুরী লিখিত "রায়তের কথা", ১৯২০, প্রবন্ধ সংগ্রহ-২, পৃ. ৪০)

বর্তমান লেখক আর-একবার নিজস্ব গবেষণাজাত সংখ্যাগত তথ্যাদি দিয়ে দেখাচ্ছেন :

ব্যবসায়ী (বণিক)/মহাজন—ইংরেজি ভাষান্তরে traders/moneylenders—কত পরিমাণ জমি নিজেদের দখলে এনেছিল। উপরে বলা হয়েছে যে, ১৮৮১-৮২ সাল থেকে ১৯০৫-০৬ সাল—এই মোট পঁচিশ বছর সময়সীমার মধ্যে ছোটো রায়তরা ৫৩৬০৭২৩ একর জমি বিক্রি/হস্তান্তর করেছিল। ব্যবসায়ী (বণিক)/মহাজনরা এ থেকে কিনেছিল বা হস্তগত করেছিল—সঙ্গত বা অসঙ্গত উপায়ে—মোট ৩৭৩৬৭৪ একর জমি, অর্থাৎ ছোটো রায়তদের হস্তচ্যুত মোট জমির শতকরা সাতভাগের মতো।

এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি মৌল বক্তব্যর সঙ্গে সহজেই একমত হতে পারি। যেমন, প্রথমত, তিনি বলেছেন, 'রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়।' তার কারণ দেখিয়ে তিনি বললেন, অন্যান্য ফুফলের মধ্যে 'এই ব্যবস্থাটা জমির উন্নতিসাধন সম্পর্কে স্বাভাবিক উৎসাহের একটা মস্ত বাধা।' এই বক্তব্যটি গভীর অর্থবহ। খাজনাবৃদ্ধি কৃষক-প্রজা কর্তৃক ফসল ফলানোর 'ইনসেনটিভ' (উৎসাহ) অর্থাৎ অনুপ্রেরণার বড়ো রকমের প্রতিবন্ধক।

তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যটি বা উপসংহারটি বেশ করে ভেবে দেখার মতো। তিনি বলছেন, 'আমাদের দেশের মূঢ় রায়তদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া।' এখানে জমি-হস্তান্তর বলতে আমরা বুঝব জমি বিক্রি বা বন্ধক। গরিব কৃষক-রায়তের হাত থেকে জমি চলে যাবে যদি বিক্রি করে। যদি বন্ধক দেয়, সুদ আর আসল ঋণ শোধ করে সে জমি ফিরিয়ে পাবে না। অতএব উভয় ক্ষেত্রেই তার ভূমিহীনতা অর্থাৎ 'আত্মহত্যার' মতো অবস্থা দাঁড়াবে। এই সমস্যার সমাধানকল্পে জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিজে এগিয়ে এসেছিলেন। সেই অন্ধকার যুগে ১৯০৪ সাল নাগাদ দরিদ্র কৃষকদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ একই কালে অল্প সুদে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া এবং জমির স্বত্ব রক্ষা ও কৃষির উন্নতি করার যুগ্ম উদ্দেশ্যে প্রথমে কালীগ্রাম (পতিসরে) ও পরে শিলাইদহে 'কৃষি-ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেছিলেন (দ্রষ্টব্য শচীন অধিকারী, "শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ", পৃ ১৪)। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে নির্দেশ দেন, 'সেই কালীগ্রাম ব্যাঙ্কটাকে বিধিবদ্ধ করে তোলা'-র জন্য (দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, র. জী. ২ খণ্ড, ১৯৭৭ সাল, পৃ ৪৮০)। এবং সেখানেই নোবেল-প্রাইজের টাকা গচ্ছিত রেখে অল্প সুদে কৃষকদের ঋণপ্রাপ্তির সমস্যা মিটিয়েছিলেন। এ ঘটনা ১৯১৪ সালের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর বারো বছর পরে (১৯২৬ 'রায়তের কথা'র 'ভূমিকা' পৃ ৯-১০ এবং 'সবুজপত্র' আষাঢ় ১৩৩৩) আরও একটা পথ আবিষ্কার করেছিলেন, 'আমার অনেক রায়তকে এই চরম অকিঞ্চনা (ঋণের জ্বালা) থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি জমি-হস্তান্তরের ওপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রক্ষা করতে বাধ্য করেছি।' (দ্রষ্টব্য, "রায়তের কথা"-র 'ভূমিকা' পৃ ৯-১৩)। স্মরণ করছি, একথা ১৯২৬ সালের (১৩৩৩) কথা। আজ থেকে তেষট্টি বছর আগের কথা। তখনকার কালে রবীন্দ্রনাথ কার্যক্রমের পথ দেখিয়ে যে বক্তব্যগুলি রেখেছিলেন, যে সুপারিশগুলি করেছিলেন, যে বাস্তব কর্ম আদর্শরূপে রেখে গেছেন, সেগুলি এবং সেই পথ এবং পথের নিশানা অঞ্চল-বিশেষে, পল্লীবিশেষে আজও অনুসরণযোগ্য। বলতে

ইচ্ছা করে, তাঁর বক্তব্যগুলি বেঁচে আছে 'আপন সত্যের জোরে'। তিনি বলেছিলেন: 'আসল কথা, যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারবে না।' বর্তমান কালের সংশ্লিষ্ট স্থানীয় দেশনেতারা স্মরণ রাখলে বোধ করি ভালো হয়, রবীন্দ্রনাথ তখন যে-পথ নির্দিষ্ট করেছিলেন পরাধীন ভারতে, আজ স্বাধীন এই দেশে বর্তমানেও আসল উপায় অনেকটা তারই ভিতর নিহিত আছে। নিজেকে বাঁচাবার শক্তি অর্জনের কথা তিনি বলেছিলেন; বলেছিলেন, 'নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরকায় নয়, খদ্দরে নয়,···ভোট দেবার অধিকারে নয়, পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।···সমস্ত গুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে।' (দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩ খণ্ড, পৃ ১৮৪, অপিচ, ১০০ সং, ১৩ খণ্ড, পৃ ৩৪৩-৩৫০)।

৪

উচিতবক্তা, সত্যসন্ধানী রবীন্দ্রনাথকে আর-এক মূর্তিতে দেখি তাঁর রাশিয়া ভ্রমণের পর। "রাশিয়ার চিঠি"তে বার্লিন থেকে লিখিত ১৩৩০ সালের ২৮শে সেপটেম্বর তারিখের পত্রে তিনি লিখলেন—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষির। (১০০ সং ১৩ খণ্ড, পৃ ৫৭৮ এবং ১০ খণ্ড, পৃ ৬৮৩)। ৩১শে অকটোবর, ১৯৩০ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন, যে রকম দিন আসচে তাতে জমিদারির উপর কোনো দিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে-মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা পাকা হয়েচে। যে-সব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম, তাই জমিদারির ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়।' (দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩ খণ্ড, পৃ ২৮৭) আমেরিকা থেকে পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে লিখছেন, 'ধনীপরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপর এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েচে,···নিজেদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমাদের গরিব প্রজাদের 'পরে যেন আর চাপাতে না হয়। একথা আমার অনেক দিনের পুরানো কথা, বহুকাল থেকেই আশা করে-ছিলুম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয়। আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারব, কিন্তু সে ওদের অংশীদারের মতো।' (দ্রষ্টব্য, চিঠিপত্র ৩, পৃ ৯১ ৯২)

শুধু যে খাতক-মহাজন, প্রজা-জমিদার সম্পর্কের এবং অশিক্ষার অন্ধকারের দিকটার উল্লেখ করে কবি ধিক্কার ও আত্মগ্লানিতে সোচ্চার হয়েছিলেন, তা বোধহয় নয়। রাশিয়ায় নানা দিক ঘুরে, বহু বিষয় পর্যবেক্ষণ করে আমাদের ভারতীয় সমাজের অন্যতম চিরন্তন মূল সমস্যা যে শোষণ, এবং উপর আর নীচের তলার মানুষের সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য, তার কথা ভুলতে পারেন নি তিনি। ১৯৩০, ১লা অকটোবর তারিখে বার্লিন থেকে লেখা পত্রে বললেন, 'আমাদের দেশে যে শ্রেণীর লোক মূক, মূঢ়, জীবনের সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাদের মন অন্তর-বাহিরের দৈন্যের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এখানে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হল, তখন বুঝতে পারলুম সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ কত প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হয়ে থাকে, —কী অসীম তার অপব্যয়, কী নিষ্ঠুর তার অবিচার' (শতবার্ষিকী, ১০ খণ্ড, পৃ. ৬৮৭)।

এই পত্র লিখবার আগে মস্কো থেকে ১৯৩০, ২০শে সেপটেমবর তারিখে যে চিঠি রবীন্দ্রনাথ লিখে-ছিলেন, বহুবার বহুস্থানে তা উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তির পুনরুল্লেখ এখানে করতে পারি। মনুষ্যসমাজের সভ্যতার কলঙ্ক, যা আবহমানকাল

পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তারই কথা কবির সংবেদনশীল মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি লিখলেন: 'চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।' (শতবার্ষিকী ১০ খণ্ড, পৃ. ৫৭৫)।

জমিদার রবীন্দ্রনাথের জমিদারির আয়ে জীবন-ধারণ করার গ্লানির অনুভূতি রাশিয়া ভ্রমণের ফলে যে তাৎক্ষণিক মানসিক উচ্ছ্বাস বা তৎকালীন অস্থায়ী প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিয়েছিল, তা তো নয়। প্রায় নয় বছর পরেও ১৪ জুলাই ১৯৩৯ সালে শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সভায় কথিত ভাষণে জমি-দারিতে তাঁর জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ আত্মগ্লানি প্রকাশ করেন। (দ্রষ্টব্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৪খণ্ড, পৃ. ১৭৬; অপিচ, প্রবাসী, ১৩৪৬, ভাদ্র, পৃ. ৬৬১-৬৬৬)। 'তখন আমি যে জমিদারি ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি করে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তারপর থেকে চেষ্টা করতুম—কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব আপনি নিতে পারে।'

আমরা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের প্রতি শুধু যে মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাই নয়, তাঁর প্রগতিমূলক পল্লী-উন্নয়ন আর রায়তের জীবিকা এবং জীবনের মান উন্নত করা-বার আগ্রহ ও কার্যকরী প্রচেষ্টা সারা জীবন ব্যেপে তিনি করে গেছেন। তাঁর মহত্ত্ব শুধু কাব্যকথায়, ভাষার উচ্ছ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকে নি; বাস্তবক্ষেত্রে নিজের জমিদারিতে এবং শ্রীনিকেতনের পল্লীগুলিতে তিনি গ্রামবাসী আর কৃষক-রায়তদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-উন্নয়নের কাজ কী ভাবে করতে হবে, তা হাতে ধরে দৃষ্টান্ত দিয়ে শিখিয়ে গেছেন। বিজ্ঞানসম্মত কৃষির প্রবর্তন, ভূমিক্ষয় নিবারণ, কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষার প্রচলন, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধন ইত্যাদি প্রগতির প্রেরণা তিনিই যুগিয়েছেন। ধনী-দরিদ্রের এবং গ্রাম-নগরের দুর্লঙ্ঘ্য প্রভেদ-বিভেদ ঘোচাবার সুষ্ঠু সাবলীল পথনির্দেশ তিনিই করেছেন। এবং সবশেষে, রাজা-প্রজা রায়ত-জমিদারের মধ্যে কুৎসিত স্বার্থের সংঘাত ঘুচিয়ে পারস্পরিক অংশী-দারের মতো সম্পর্ক স্থাপনের সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। এসব বিষয়ে সেকালের জমিদারদের মধ্যে বোধ করি রবীন্দ্রনাথই ছিলেন একমাত্র এক বিশিষ্ট বিপ্লবী চিন্তানায়ক ও কর্মবীর।

মনে পড়ে, ১৮৭৮ সালে (১২৮৪ বঙ্গাব্দে) 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম বর্ষে পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় সতেরো বছরের কিশোর কবি রবীন্দ্র "কবিকাহিনী" কাব্যে কাঁচা হাতে যে-কবিতা রচনা করেছিলেন, নিজের অজ্ঞাতে সেই বালক বয়সেই তাঁর মানবপ্রীতির এবং বিশ্বপ্রেমের অঙ্কুর যা উদ্‌গত হয়েছিল,—যা সঙ্গীতের সুরের মতো তাঁর অন্তর অধিকার করেছিল, তারই ধ্বনি যে তাঁর নিজের পরবর্তী জীবনে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হবে, তা নিশ্চয়ই তখন তিনি জানতেন না। অন্যের উচ্চারিত উক্তি সম্বল করে তখন লিখিত হলেও সেই সহজ সরল আদর্শের ছবি তাঁর মানসপটে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল—একথা উপরে লিখিত আমাদের সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বললে বোধ হয় অবান্তর হবে না। বালক কবি সেই কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে লিখেছিলেন, 'নাইক দরিদ্র ধনী, অধিপতি, প্রজা,/ কেহ কারো কুটিরেতে করিলে গমন / মর্যাদার অপমান করিবে না মনে, / সকলেই সকলের করিতেছে সেবা, / কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস! / ···যেই দিন একপ্রেমে হইয়া নিবদ্ধ / মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়!' (দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭)।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

১১

আমাদের আলোচনার সর্বশেষ অংশ ওরাওঁ আন্দোলন (১৯১৪-১৯২০)। ১৯০০ সাল পর্যন্ত তাদের আলাদা কোনো আন্দোলন ছিল না। মুণ্ডা বিদ্রোহ নামে যা পরিচিত, তাতে ওরাওঁরাও যোগ দিয়েছিল।

বস্তুত, তাদের নূতন আন্দোলনে মুণ্ডাবিরোধী মনোভাব ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে। তাদের ধারণা ছিল, ১৮৯৯-১৯০০-র ব্যর্থ বিদ্রোহে প্রধান ভূমিকা ছিল মুণ্ডানেতাদের; এ বিদ্রোহকে নির্মূল করার জন্য সরকারের নির্মম দমননীতি তাদের সমাজ আর অর্থনীতিতে এনেছে বিপর্যয়।

তাদের নূতন 'ধর্মসংস্কার আন্দোলনে'ও মুণ্ডা-বিদ্বেষ সুস্পষ্ট। সহিংস সংঘর্ষের শোচনীয় ব্যর্থতার পর সাঁওতালদের মতো তারাও ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারকে বর্তমান বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার একটা প্রধান উপায় বলে ভাবল। তাদের কিন্তু চেষ্টা ছিল, যাতে মুণ্ডাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব সর্বতোভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায়। তারা বলল, মুণ্ডাদের সংস্পর্শের ফলেই তাদের ধর্মীয় জীবনের আদি পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে; গোড়াতে ভগবানের একত্বে বিশ্বাস তাদের ধর্মচিন্তার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল; কিন্তু মুণ্ডা-প্রভাবে তারা বহু দেব-দেবী, ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করতে থাকে। সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নূতন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট দিক।

'টানা ভগৎ' আন্দোলন নামে পরিচিত এ সংস্কার-প্রয়াস সম্পর্কে দুটি প্রচলিত ধারণার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

রিজলী (Risely) মনে করেন[২২২] ভগৎদের চিন্তা এবং ভাবাদর্শে নূতন কিছুই নেই; আসলে তারা ওরাওঁ সমাজের জাদুবিদ্যাকুশলী 'মাটি' সম্প্রদায়ের সমগোত্রীয়। ওরাওঁ জাদুবিদদের দুটি সম্প্রদায়: মাটি বা ওঝা, যারা অশুভ-শক্তির সঙ্গে

সম্পৃক্ত জাদুকলার চর্চা করত; ভগৎ বা সোকা, যারা ছিল মঙ্গলময়-শক্তির প্রয়োগেই আগ্রহী।

ওরাওঁ জাতির ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত শরৎচন্দ্র রায় রিজলীর মতকে খণ্ডন করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত—ভগৎরা মাটিদের পদ্ধতি অনুযায়ী অতি-প্রাকৃত শক্তি অর্জন করতে চায় নি। মাটিরা প্রধানত মন্ত্র এবং জাদুর মাধ্যমে আধিভৌতিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করত। ভগৎদের সাধনপদ্ধতি ভিন্ন। বিধিবদ্ধ ধ্যান এবং আচারের মধ্য দিয়ে শুদ্ধ চিত্ত হয়ে তারা ভগবানের সান্নিধ্যলাভে প্রয়াসী ছিল। আধিভৌতিক কোনো শক্তির মধ্যস্থতা তারা স্বীকার করত না।

আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় ধারণা শরৎচন্দ্র রায়ের। তিনি মনে করেন, নূতন ভগৎ আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে পরিচিত ভগৎদের চিন্তা-ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। টানা ভগৎ আন্দোলনে নূতন লক্ষণ কিছুই নেই। তা ছাড়া, তাঁর ধারণা, এ আন্দোলন প্রধানত ধর্মসংস্কার-সম্পর্কিত; রাজনীতির সঙ্গে এর আদৌ কোনো সংস্রব নেই।

নূতন আন্দোলনের নেতারা নিজেদের ভগৎ বলে পরিচয় দিলেও আগেকার ভগৎ-আন্দোলনের সঙ্গে এর পার্থক্য মৌলিক। পূর্ববর্তী ভগৎ-ঐতিহ্য কয়েক-জন মাত্র ওরাওঁয়ের সাধনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে-ছিল। কয়েকটা পরিবারের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। বৃহত্তর ওরাওঁ সমাজের সঙ্গে তাদের যোগ ছিল ক্ষীণ। বস্তুত, ব্যক্তিগত জীবনে যে কঠিন অনুশাসনের কথা তারা বলত, সাধারণ ওরাওঁদের পক্ষে তার অনুসরণ সহজসাধ্য ছিল না।

পক্ষান্তরে, উদ্দেশ্য এবং সংগঠনের দিক থেকে টানা ভগৎ-আন্দোলন মূলত যৌথ আন্দোলন। বহু-সংখ্যক ওরাওঁ যাতে নূতন ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক বিধান, আচার গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য সংঘবদ্ধ চেষ্টা নূতন আন্দোলনের একটা বিশিষ্ট দিক। ওরাওঁ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র রায়ের অন্য ধারণার বিচার করব। টানা ভগৎ আন্দোলনে ধর্ম আর রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য যোগ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

শরৎচন্দ্র-সংগৃহীত টানা ভগৎদের গান থেকে নূতন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের চরিত্র বোঝা যায়।[২২৩] ভগবানের একত্বে বিশ্বাস নূতন ধর্মচেতনার প্রাণকেন্দ্র। এ বিশ্বাস 'সত্য ধর্ম'। এই এক পরমেশ্বর "জ্ঞান ও বাক্‌দাতা"; তাই দিনে-রাতে-সকাল-সন্ধ্যায় ওরাওঁরা তাঁর ধ্যান করবে।

এর জন্য তাদের বহু বিশ্বাস, সামাজিক অনুশাসন, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। বিশেষ করে, ভূত, প্রেত, ডাইনিবিদ্যায় তাদের দীর্ঘকালের বিশ্বাস বাদ না দিলে 'সত্যধর্মে'র উপলব্ধি সম্ভব নয়। 'ভূতে' বিশ্বাস তাদের ধর্মচিন্তার এক বিশিষ্ট দিক। তাদের ধারণা ছিল, যা-কিছু অশুভ, তাদের আছে আলাদা-আলাদা 'সত্তা',—ভূত; যেমন, ভৌতিক অস্তিত্ব আছে অমঙ্গলসৃষ্টিকারিণী ডাইনির, কুচক্রান্তে খুন হওয়া কোনো লোকের। সাম্প্রতিক কালের অনেক নূতন যন্ত্রশক্তিও তাদের কাছে অশুভ বলে মনে হয়েছিল, যেমন রেল, অন্যান্য বাষ্পীয় যান। এগুলিও ভূতে মূর্ত। নূতন ধর্মমতে, সর্বব্যাপী এ ভূতে বিশ্বাস এক-ভগবানের বোধকে খণ্ডিত করে। অশুভ নানা শক্তিকে জয় করার জন্য পরমনিষ্ঠায় ভগবানকে ধ্যান করতে হবে; তা ছাড়া অবিরত সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়েও অবাঞ্ছিত ভৌতিক প্রভাব কাটিয়ে ওঠা যায়।

সাঁওতাল এবং মুণ্ডা ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মতো, এখানেও নূতন চিন্তাভাবনার প্রধান ঝোঁক—উন্নততর সমাজসৃষ্টির জন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বহু দিক সম্পূর্ণ বর্জনীয়; অনেক বিশ্বাস, প্রথা, রীতিনীতি টেনে উপড়ে ফেলতে হবে। তাই নতুন আন্দোলনের নাম 'টানা' আন্দোলন।

১১.১

ধর্মগুরু-নির্দেশিত টানা ভগৎ আন্দোলনের বিভিন্ন

পর্যায় আলোচনা করলে দেখা যাবে, রাজনীতির সুর এতে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রথম আন্দোলন[২৯৪] শুরু হয় ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে, গুমলা সাবডিভিশনে, গুরু যাত্রা ভগতের নেতৃত্বে। তার চিন্তায় পূর্ববর্তী সাঁওতাল আর মুণ্ডা আন্দোলনের প্রভাব সুস্পষ্ট। সিধু-কানু ও বীরসার মতো যাত্রারও প্রথম ঘোষণা ছিল, ওরাওঁ সমাজের আমূল পুনর্বিন্যাসের জন্য তার আন্দোলন ভগবান-নির্দেশিত। বীরসার মতো তারও ধারণা, এ কলুষময় বর্তমান সমাজের অনেক দূরে নূতন জগৎ সৃষ্টি করতে হবে; জীবিকা হিসেবে কৃষিকাজ নিষ্প্রয়োজন; শিষ্যদের যাত্রা বলত, চাষবাসের তো বিরতি ছিল না, অথচ দুর্ভিক্ষ কোনো দিন দূর হয় নি; ওরাওঁদের দুর্দশাও ঘোচে নি।

প্রথম আন্দোলনে কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি ছিল না। কিন্তু শিষ্যদের কাছে নানা ঘোষণায় তার রাজনৈতিক চিন্তার পরিচয় মেলে; যেমন—কুলির কোনো কাজ তারা করবে না; বাঙলা ও আসামের চা-বাগানে তারা কুলি হিসেবে যাবে না; জমিদার, এমনকী সরকারের অধীনেও, তারা দিন-মজুরি করবে না। তার এ নির্দেশ প্রচারের জন্য কিন্তু কোনো সংগঠন ছিল না। তার ধারণা ছিল, ওরাওঁদের সমবেত মন্ত্রোচ্চারণ এবং সঙ্গীতে সব অশুভ-শক্তির বিনাশ হবে।

যাত্রার দ্বিতীয় আন্দোলন শুরু হয় ১৯১৫ সালের অকটোবরে; মাস তিনেক চলে। এর ব্যাপ্তি ছিল অনেক বেশি—উত্তর-পশ্চিমে পালামৌ এবং উত্তরে হাজারিবাগ জেলা পর্যন্ত। এর একটা কারণ—যুদ্ধের ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা পণ্যের (কাপড়-চোপড়, কেরোসিন ইত্যাদি) আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি গোটা অঞ্চলে চরম দুর্দশা সৃষ্টি করে। যাত্রার ভাবাদর্শ প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন এ সময় থেকে গড়ে উঠতে থাকে। সমবেতভাবে গাইবার জন্য অনেক গানও সম্ভবত তখন রচিত হয়।

রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে এ-আন্দোলন অনেক পরিণত। নির্দিষ্ট কর্মসূচি তখনো একান্তই সীমাবদ্ধ। জমিদারের খাজনা বন্ধ করার কথাই প্রধানত বলা হয়েছিল। জমিদারি প্রভুত্বের উপর এটা সরাসরি আঘাত।

কিন্তু যাত্রার নানা ঘোষণায় এক ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত মেলে। তার এ ধারণা তখনও অস্পষ্ট। কিন্তু বিদ্রোহী ওরাওঁদের চেতনার রূপান্তর প্রসঙ্গে এর বিশেষ তাৎপর্য আছে।

ব্রিটিশরাজের আসন্নপ্রায় অবসান সম্পর্কে কোনো ওরাওঁ নেতার সচেতনতা এই প্রথম দেখা গেল। এর ভিত্তি মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মানদের কাছে ব্রিটিশ সেনার উপর্যুপরি পরাজয়। ব্রিটিশ শক্তির দুর্জয় পরাক্রম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ভেঙে গেল।

কিন্তু ব্রিটিশ-রাজের বদলে যে ওরাওঁরাজ কায়েম হবে, এমন কোনো ধারণা ওরাওঁদের ছিল বলে মনে হয় না। ওরাওঁ অঞ্চলে জার্মান রাজের প্রতিষ্ঠা হবে বলেও সম্ভবত তারা ভাবছিল না। শুধু এটুকু বোঝা যায়—ব্রিটিশদের সামরিক বিপর্যয় তাদের উল্লসিত করেছিল; আর জার্মান শৌর্য-বীর্যের নানা কাহিনী তাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জার্মান-শক্তি ওরাওঁদের পরম উপাস্য দেবতা 'সূর্য' ও 'চন্দ্র' দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হল। তাদের সমবেত গানে বার-বার 'জার্মান বাবাকে' আহ্বান করা হল। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: জার্মান শক্তি তাদের দেবতায় রূপান্তরিত হল কিভাবে? যা কিছু প্রবল, শৌর্যময়, শুধু তাই ওরাওঁদের কাছে দেবত্বের প্রতীক নয়; 'সূর্য' ও 'চন্দ্র' দেবতা শুভ-শক্তির প্রতীক, মঙ্গল-বিধায়ক। জার্মান-শক্তিকে এ প্রতীকরূপে ধারণা করার মধ্য দিয়ে বোঝা যায়, ওরাওঁরা জার্মান-শক্তি থেকে মঙ্গল প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু এ প্রত্যাশা পূর্ণ করার উপায় সম্পর্কে ওরাওঁদের ধারণা আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

এ আন্দোলনের রাজনৈতিক চেতনার অস্পষ্টতা পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে ক্রমেই দূর হয়ে যায়।

ওরাওঁদের পরবর্তী আন্দোলনের (জানুয়ারি-জুন ১৯১৬) কেন্দ্র রাঁচীনয়; জলপাইগুড়ির চা-বাগিচা। (জলপাইগুড়ির ওরাওঁদের প্রায় ৬৭ শতাংশ চা-বাগানে কুলি হিসেবে কাজ করত।)[২৯৫]

এ আন্দোলনের কেন্দ্র স্বতন্ত্র বটে; কিন্তু এটা রাঁচী অঞ্চলে আগেকার আন্দোলনের একটা পর্যায় মাত্র। প্রশাসনের সতর্কতার জন্য সেখানে আন্দোলন ছড়াতে পারে নি।

জলপাইগুড়ির ওরাওঁ চা-কুলিদের সঙ্গে তাদের মাতৃভূমির যোগসূত্র মোটেই ছিন্ন হয় নি। বছরের বিশেষ সময়ে তারা চা-বাগানে রুজি-রোজগারের জন্য আসত; আবার বর্ষা শুরু হলে চাষের কাজের জন্য তাদের অনেকেই ফিরে যেত। তাই রাঁচী অঞ্চলের নূতন আন্দোলনের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। কিন্তু জলপাইগুড়ির আন্দোলনের মূল প্রেরণা রাঁচী-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লাণ্ডুরু ওরাওঁ-এর ব্যক্তিত্ব। যেসব ওরাওঁ-সর্দার চা-বাগানের জন্য কুলি জোগাড় করত, তাদের সঙ্গে লাণ্ডুরু প্রথমে যোগাযোগ করে। তার ভাই হাসুরু সর্দার ছিল বলেই লাণ্ডুরুর পক্ষে চা-বাগানে ঢোকা সম্ভব হয়েছিল। হাসুরু ছাড়া, অন্য দুই নেতা, লেখো এবং দুখিয়াও ছিল সর্দার।

রাঁচীর আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে এখানেও 'শুদ্ধি-আন্দোলন' ওরাওঁ-সংগঠনের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ হিসেবে দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘদিন জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বাস সত্ত্বেও স্থানীয় লৌকিক সংস্কৃতির কোনো ছাপ এ শুদ্ধি-আন্দোলনে ছিল না।

কিন্তু রাঁচীর আন্দোলনের সঙ্গে এর একটা বিশিষ্ট পার্থক্য আছে; তা হল, এর সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র। এ রাজনীতি কিন্তু চা-মালিক-বিরোধী বিদ্বেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। চা-কুলি হিসেবে ওরাওঁদের কোনো অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন গড়ে ওঠে নি।

মালিকদের প্রতি বিরূপতা আর আক্রোশের যে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, তার কারণ—মালিকরা নানাভাবে ওরাওঁদের সমবেত সঙ্গীত-অনুষ্ঠানে বাধা দিচ্ছিল।

এ আন্দোলনে রাজনৈতিক চেতনার বৈশিষ্ট্য সহিংস পন্থায় ব্রিটিশরাজের উৎসাদনের পর স্বাধীন ওরাওঁ-রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। ওরাওঁ নেতারা অবশ্য কখনো বলেন নি তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ফলেই এ পরিবর্তন ঘটবে। রাঁচীর মতো এখানেও ধারণা সক্রিয় ছিল, জার্মান-শক্তির হাতেই ব্রিটিশ রাজের বিনাশ ঘটবে। এতে ওরাওঁদের ভূমিকা, সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে তারা শক্তিধর "জার্মান বাবা"কে আহ্বান করবে।

এ আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্বেই তীব্র ব্রিটিশ-রাজ-বৈরিতা সুস্পষ্ট। ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাস থেকেই এ আন্দোলনের আভাস মেলে। সরকারি এক বিবরণে বলা হয়েছে: 'হাসুরুর বাড়ির উঠোনে সভা হত; হাসুরু আর কাণ্ডু তর্পণ করার ভঙ্গিতে জল ঢালত, প্রথমে পুবদিকে সূর্যদেবতার উদ্দেশে, তারপর পশ্চিমদিকে জার্মান-বাবার উদ্দেশে; তারপর সঙ্গে-সঙ্গে গান শুরু হত। গানের বিষয়: সূর্যদেবতা এসে দুরাত্মা শয়তানদের দূর করে দেবে এবং সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে মারবে। তাদের ধারণা জার্মানরা এসে সব ইংরেজদের খতম করবে; আর তিন বছরের মধ্যে ওরাওঁ-রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।'

১৯১৬-র শুরু থেকে বেশ কয়েকটা চা-বাগানে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। খুব সম্ভবত সমবেতভাবে গাওয়ার জন্য কিছু-কিছু নূতন গানও এ সময় রচিত হয়। আন্দোলনের মূল প্রকৃতি কিন্তু সব অঞ্চলে মোটামুটি একই ধরনের: সমবেত-গানের মধ্য দিয়ে অশুভ-শক্তির বিনাশ।

গানের মধ্য দিয়ে ওরাওঁদের এ প্রতিরোধ আন্দোলনের কারণ শুধু এ নয় যে, চা-মালিকেরা অন্য

ধরনের প্রকাশ্য রাজনীতি বরদাস্ত করত না। ওরাওঁদের এক ধর্মবিশ্বাস সম্ভবত এখানে সক্রিয় ছিল। যেখানে ওরাওঁদের আচার-আচরণ বা গতিবিধির উপর চা-মালিকের কঠোর নিয়ন্ত্রণ একেবারেই ছিল না, সেখানেও ওরাওঁ-আন্দোলনের একটা বিশেষ দিক এ ধরনের সমবেত সঙ্গীত।

ওরাওঁদের বিশ্বাস ছিল, শুভ বা অশুভ শক্তি অমূর্ত বিদেহী নয়। সব শক্তি বিশেষ-বিশেষ রূপে মূর্ত। সমবেত সঙ্গীতের উদাত্ত ধ্বনি অমঙ্গলের শক্তির মূর্তরূপ নানা ধরনের ভূতপ্রেতকে, তাদের গোপন নিবাস থেকে বিতাড়িত করবে।

কিন্তু চা-মালিকদের সতর্ক দৃষ্টি এড়ানোর জন্য গানের ভাষাতে এমন প্রতীকের ব্যবহার করা হত, যাতে মালিকরা গানের নিগূঢ় অর্থ সহজে ধরতে না পারে। এমনও হতে পারে, ওই বিশেষ প্রতীকই ওরাওঁ-মানসিকতা প্রকাশের একটিমাত্র সহজ ভাষা। রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত ওরাওঁদের কেউ-কেউ আদালতে [গানের মর্মার্থ] বুঝিয়ে বলে।

প্রতিরোধ-আন্দোলনের উপায় হিসেবে সমবেত সঙ্গীতের ভূমিকা সম্পর্কে ওরাওঁ-নেতারা এত নিঃসংশয় ছিল যে, সমবেত সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদানে অনিচ্ছুক ওরাওঁদের নানাভাবে শাসানি দেওয়া হত। আসলে এ ধরনের একটা ঘটনা থেকে এ আন্দোলনের প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহিতা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে প্রথম ধরা পড়ে।[২২৬]

ঘটনাটা এই : ছাড়ুয়া ওরাওঁ তার স্ত্রীর গলা কেটে পরে আত্মহননের চেষ্টা করে। তার এ অপরাধের কারণ হিসেবে সে পুলিশকে বলে, অন্য ওরাওঁরা তাকে নিয়মিত জার্মানদের নামকীর্তনে যোগ দিতে বলে। তাকে তারা এই বলে শাসায়, যদি সে যোগ না দেয়, লোগো-নামক শয়তান এসে তাকে মেরে ফেলবে। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করল, এভাবে মারার থেকে আত্মহনন শ্রেয়। পুলিশের কাছে সাক্ষ্যে সে আরও বলে, এক অজ্ঞাতনামা ওরাওঁ তাকে সব সময় এ ধরনের গান গাওয়ার জন্য বলত। এতে কোনো আপত্তি করলে, পড়শিরা তাদের গালিগালাজ করত। এতে উত্যক্ত হয়েই তারা এ চরম পথ বেছে নেয়।

ওরাওঁদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের প্রমাণ হিসেবে বাদী সরকার পক্ষ তাদের কয়েকটা গান আদালতে পেশ করে। এগুলি থেকে তাদের মানসিকতার পরিচয় মেলে। একটা গান উদ্‌দ্বৃত করছি :

> জার্মান বাবা আসছে,
> ধীরে-ধীরে আসছে ;
> মনলদনল শয়তানদের দূর করবে ;
> অথৈ-সমুদ্রে ছুঁড়ে দেবে ;
> স্বরাজ-বাবা আসছে ;
> চুল্লীর শয়তানরা দূর হবে ;
> নিক্ষিপ্ত হবে অথৈ সমুদ্রে ;
> তারিজান বাবা (নক্ষত্র) আসছে ;
> ধীরে ধীরে আসছে ;
> আমাদের উঠোনের ভিতরেই আসছে ;
> চিগ্রী শয়তানরা দূর হবে ;
> নিক্ষিপ্ত হবে সাগরজলে।

আদালতে এক ওরাওঁ এ গানের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে : শুভশক্তির প্রতীক জার্মানরা, আর অমঙ্গলের প্রতীক ব্রিটিশ শক্তি; জার্মানরাই সূরজবাবা, এবং তারিজান-বাবা, যারা ওরাওঁদের মঙ্গলময় দেবতা। তাদের লোকগাথায় মনলদনল এক নির্মম প্রতিহিংসাবৃত্তির মূর্ত-শয়তান; তার পুজোর নৈবেদ্য হিসেবে যদি একবার কোনো কেউ ষাঁড় বলি দেয়, পরে অনবরত এ বলি দিয়ে যেতেই হবে। জার্মানরা ইংরেজদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করবে ; 'চুল্লীর শয়তান' হল সেসব ওরাওঁ যারা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে; তাদের বিনাশও অবশ্যম্ভাবী।[২২৭]

অন্যান্য জায়গায় ওরাওঁ-আন্দোলনে স্থানীয় শ্রেণী-সম্পর্কের প্রভাব অনিবার্যভাবে এসে গেছে। অসহ-যোগ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত এ আন্দোলনের দুটি পর্যায় : পালামৌ অঞ্চলে (ডিসেম্বর ১৯১৫-মে

১৯১৮); এবং আবার রাঁচীতে (মার্চ ১৯১৯-জানুয়ারি ১৯২০)। রাঁচীর আন্দোলন অনেক বেশি সংগঠিত ; কয়েকটা দিক থেকে তা বিশিষ্টও।

পালামৌর আন্দোলনে যাত্রা ভগৎ-পরিচালিত আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব সুস্পষ্ট। এ অঞ্চলে ওরাওঁদের কোনো সংগঠিত বিক্ষোভ আগে দেখা যায় নি।[২২৮]

শুদ্ধি-আন্দোলনের সামগ্রিক রূপ আবার এখানে ফিরে আসে। জলপাইগুড়িতে তা অংশত দেখা যায়; সেখানে ব্রিটিশ-বৈরিতার রাজনীতি আন্দোলনের অন্যান্য দিককে খানিকটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পালামৌতে প্রথম দিকের আন্দোলনের বিশিষ্ট রূপ এ শুদ্ধির মানসিকতা।

এখানে আন্দোলনের শুরু ব্যাপকভাবে শুয়োর, মোরগ, মুরগি মারা দিয়ে ; কারণ ওরাওঁদের ধারণা, তারা অশুদ্ধি, অপবিত্রতার উৎস। রাঁচীর আন্দোলনের আরো একটা প্রভাব এখানে লক্ষণীয়—কৃষিকাজ বর্জন করার প্রবণতা।

১৯১৮ সালের আন্দোলনে রাজনৈতিক কর্মসূচী সুনির্দিষ্ট। মার্চের গোড়া থেকে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান হিসেবে গ্রামে-গ্রামে শালপাতা পাঠানো হয়। বিদ্রোহ শুরু করার সংকেত এল এপ্রিলের মাঝামাঝি। রাঁচীর আন্দোলনের সঙ্গে এর একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য, এর সহিংস চরিত্র। পুলিশ, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত বহিরাগতরা, স্থানীয় জমিদার—এরাই ছিল ওরাওঁদের আক্রোশ এবং প্রতিহিংসার শিকার। আর নিগৃহীত হয় কৃষক সম্প্রদায়ের দুই গোষ্ঠী : কাহার এবং আহীর ; এরা সবাই বহিরাগত ; নানাভাবে ওরাওঁদের জোতজমা আত্মসাৎ করে নিচ্ছিল। এতে জমিদারেরও সায় ছিল ; কারণ তাদের ধারণা ছিল, ওরাওঁদের তুলনায় এরা কৃষিকাজে অনেক বেশি দক্ষ।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় শেষ ওরাওঁ আন্দোলনও দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল : মার্চ ১৯১৯-জানুয়ারি ১৯২০।[২২৯]

এটাকে পূর্ববর্তী যাত্রা-ভগৎ-নির্দেশিত আন্দোলনের একটা পরিণত পর্যায় বলা যেতে পারে। পুলিশি সতর্কতার জন্য যাত্রার আন্দোলন কিছুকালের জন্য স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু নূতন নেতৃত্বে তা আবার নানা জায়গায় আত্মপ্রকাশ করে। জলপাইগুড়ি এবং পালামৌর পর আবার তা রাঁচীতে শুরু হয়।

যে-সমস্ত অঞ্চলে যাত্রার আন্দোলন ছড়িয়েছিল, এ আন্দোলনও মোটামুটিভাবে সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেও শুদ্ধি আন্দোলনের উপর সমান জোর। কয়েকটি অঞ্চল বাদ দিলে এখানেও নেতারা যথাসম্ভব হিংসা পরিহার করার জন্য অনুগামীদের বলেছিল। "জার্মান বাবা"র কথা মাঝে মাঝে বলা হলেও, তার উপর নির্ভরশীলতা ছিল না। আগেকার মতো জার্মান শক্তির হাতে ব্রিটিশ রাজের বিনাশ ঘটবে, আগের এ ধারণা অনেক ক্ষীণ হয়ে আসে। অথচ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে স্বাধীন ওরাওঁ-রাজ প্রতিষ্ঠার কথা তারা কখনও ভাবে নি। আন্দোলনের কোনো-কোনো পর্যায়ে তারা ব্রিটিশ রাজের অবসান ঘোষণাও করেছে। কিন্তু এ বিশ্বাস সাময়িক। শুদ্ধি-আন্দোলন ছাড়া তাদের মুক্তির উপায় হিসেবে নেতারা একটা কথা বার-বার বলত। তা হল, সংগঠিতভাবে দীর্ঘদিন তাদের আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়ে শত্রুকুলের মনোভাব পালটাবে।

নূতন আন্দোলনের এটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। নূতন আদর্শে দীক্ষিত অগ্রপ্রাণিত অনুগামীর সংখ্যা বাড়াতে হবে—নানা ভাবে এ আদর্শের প্রচার করতে হবে ; তাদের লক্ষ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই বলে পুলিশ, প্রশাসন, এবং সব বহিরাগত শত্রুদের বোঝাতে হবে তারা কী চায়। তাই দরকার নূতনভাবে সংগঠনকে শক্তিশালী করা, এবং তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

এ আন্দোলনের নেতা শিবু ওরাওঁ যাত্রার

আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। তার বাবা রিবু ওরাওঁয়ের জোতজমা এত স্বল্প ছিল যে জীবিকার জন্য শিবুকে দিনমজুরি করতে হত। কিন্তু আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয় নি।

আগেই উল্লেখ করেছি, পুলিশি সতর্কতার জন্য যাত্রার আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। সংগঠনের পক্ষে আরো বড়ো বিপর্যয় : ১৯১৬ সালের ব্যাপক কলেরা মহামারী। সরকারি রিপোর্টে এমনও বলা হয়েছে, শিবু এবং তার অনেক অনুগামী নূতন ধর্মান্দোলন থেকে সরে যায়। সম্ভবত তা স্বল্পকালের জন্য। কিছু দিনের মধ্যেই শিবু এবং তার এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী পরভু ওরাওঁ নূতনভাবে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হয়। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী, তাদের প্রধান কাজ ছিল অনবরত গ্রামে ঘুরে-ঘুরে ওরাওঁদের নূতন আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করা। সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি এবং অনুগামীদের কর্মতৎপরতায় পুলিশের টনক নড়ে। ১৯১৯ এর ফেব্রুয়ারি মাসের এক সরকারি রিপোর্ট থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

মার্চ মাসেই শিবু তার নূতন আন্দোলন ঘোষণা করে। সাঁওতাল এবং মুণ্ডা ধর্মগুরুর মতো সেও বলে, ভগবানের নির্দেশেই ওরাওঁ সমাজ ও ধর্মের আমূল সংস্কারে সে নেমেছে। এ ঘোষণায় ওরাওঁ অঞ্চলে সাড়া পড়ে যায়। সিধু-কানু ও বীরসার মতো তার দর্শনলাভের জন্য দলে-দলে ওরাওঁরা তার গ্রামে আসতে থাকে—এমনকী পালামৌ এবং হাজারিবাগ থেকেও। সপ্তাহ তিনেক ধরে (১৪ই ফেব্রুয়ারি-৫ই মার্চ ১৯১৯) তারা তাঁবু খাটিয়ে স্থানে থেকে যায়। পুলিশ ইনস্‌পেকটর আলি-রাজা জানতে পারে, শিবুর নির্দেশেই তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। জমায়েতের জায়গাটাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছিল, যেন মণ্ডপ। পূজাবাড়ির সামনে উড়ছিল শ্বেত-পতাকা।

আলি-রাজার কাছে তার মতাদর্শের ব্যাখ্যায় শিবু কিন্তু শুধুমাত্র ওরাওঁদের সমাজ-সংস্কারের কথা বলে নি। প্রথম আন্দোলনের সময় (১৮৯৫) বীরসার ঘোষণার মতো শিবুর ব্যাখ্যারও মূল সুর, তামাম দুনিয়ার উদ্ধারই তার ব্রত। আলি-রাজার কাছে শিবুর এ ছিল ভবিষ্যদ্বাণী : 'পুরনো পৃথিবীর বিধান সে পালটাবে; আসন্ন হোলি উৎসবের পর ঘটবে বিপুল এক পরিবর্তন। চিঠি মারফত ভগবান তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, এ পৃথিবীর সংস্কার করতে হবে...'

অনুগামীদের কাছে শিবুর নির্দেশে কিন্তু বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা ছিল না। এ নির্দেশ মৌখিকও নয়। হিন্দি ভাষায় লিখিত ছোটো-ছোটো পুস্তিকায় তার সব প্রচার সম্বলিত ছিল। তার প্রতিলিপিই নানা জায়গায় পাঠানো হয়। সেখানে বৃহৎ পৃথিবীর কথা নেই; আছে শুধু ওরাওঁদের অভাব-অভিযোগ, তাদের শ্রেণী-শত্রুদের কথা। এ ধরনের কিছু ঘোষণা এবং নির্দেশ উদ্ধৃত করছি :

'জমিদাররাজ আর নেই। পৃথিবীর অধিকার ধার্মিক ব্যক্তিদের। কেউ কোনো খাজনা বা চৌকিদারি-ট্যাক্সো দেবে না।

'বানিয়ারা বাজারে ঢুকবে না। তারা সাধারণ মানুষের বিত্তসম্পদ লুঠ করে (ব্যাপকভাবে প্রবঞ্চিত করে); মাড়োয়ারিরা চড়া দামে কাপড়-চোপড় বেচে; আর ধার্মিক মানুষদের ঠকায়। মাড়োয়ারিরা, তোমাদের কাপড়-চোপড় পুড়ে ছাই হোক। ভবঘুরে এবং তাদের বারবণিতারা ফাল্গুন মাস (ফাগ উৎসব) আসার সঙ্গে-সঙ্গেই নিপাত যাবে। মুসলমানেরা, তোমরা নিপাত যাও।

'প্রথম যখন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, রাজা এবং জমিদারেরা এখানে আসে, তাদের কিছুই বলতে ছিল না। আর এখন তাদের ক্ষমতা এত বেড়েছে যে তারা ওরাওঁদের মারতে ছাড়ে না। সবচাইতে নীচু জাতের লোক খ্রীষ্টানরা। ভগবান তাই বলেছেন।' স্থানীয় থানার পুলিশ রমজান দফাদারকে পাঠানো পুস্তিকায় ওরাওঁ শত্রুদের কাজকর্মের আরও বিস্তৃত খতিয়ান

আছে : 'মুসলমানরা গরু জবাই করে; তাই তাদের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। মাড়োয়ারিরা চড়া হারে কাপড় বেচে; তাই তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে। জমিদার খাজনা নেয়, আর নাচোওয়ালি মেয়ে পোষে; তাদের দূর করে দিতে হবে; কোনো ট্যাক্সো (খাজনা) আর তাদের দেওয়া হবে না।'

শুধু নানা জনের কাছে হিন্দিপুস্তিকা বিলোনো শিবু যথেষ্ট মনে করে নি। নিকট অনুগামীদের নিয়ে সে অনবরত গ্রামে-গ্রামে ঘুরে তার আদর্শের কথা বোঝাত। যে ছোটো-যানে তার অনুগামীরা তাকে বয়ে নিয়ে যেত, সে তার নাম দিয়েছিল 'জাহাজ'। তা ছাড়া, ওরাওঁদের সঙ্গে যারা এতদিন নানাভাবে দুর্ব্যবহার করে আসছে, তাদের উৎপীড়ন করেছে, শিবু তাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের হাবভাব পালটাতে বলে। বোঝানোতে কাজ না হলে শিবু তাদের শাসাতও। জগদেওনন্দন তেওয়ারী এবং জগজীবনানন্দ তেওয়ারী—গ্রামের দুই জমিদারকে শিবু ধমকিয়ে বলে : 'বড্ডো বেশি তোমরা ট্যাক্সো আদায় করছ; তোমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে।' শত্রুদের অনমনীয় মনোভাবে অসহিষ্ণু হয়ে শিবু ওরাওঁদের বলেছিল : 'আগামী কাল ওরাওঁ ছাড়া আর সবারই হাত আমরা কেটে ফেলব।'

তখনকার পুলিশি তৎপরতা থেকে মনে হয়, এ ধরনের শাসানির কথা ওরাওঁ-শত্রুদের অগোচর থাকে নি। তারা ক্রমেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। একটা রিপোর্টে বলা হয় : 'শিবুর প্রচারে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতার ভাব বেড়ে যাচ্ছে—যেমন, ওরাওঁদের সঙ্গে মুসলমান এবং মাড়োয়ারিদের, জমিদারের সঙ্গে প্রজার।' আরো বলা হয়, আদিবাসী ছাড়া 'রাঁচীর অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের ভাব বাড়ছে; ছোটোখাটো ঘটনাকেও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে।' এক মিশনারি পুলিশাধ্যক্ষকে এ ধরনের এক গুজবের কথা লেখে : 'ভগৎরা ঠিক করেছে, প্রয়োজনের তুলনায় নারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে; এদের একটা অংশকে মেরে ফেলতে হবে—সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্য যতজন দরকার, তাদেরই শুধু রাখা হবে।'

পুলিশ শিবু আর তার এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী মাথা ওরাওঁকে গ্রেপ্তার করে (১৭ই মার্চ)। আন্দোলন তখন থেকে এক নতুন মোড় নেয়। বিক্ষুব্ধ ভগৎরা প্রকাশ্যে বলতে থাকে, যে-কোনো রকমেই হোক, তারা নেতাদের মুক্ত করে আনবে। নিজের পরিচয় গোপন করে ছোটোনাগপুরের কমিশনার তাদের মনোভাব প্রত্যক্ষভাবে জানার জন্য ওদের এক জমায়েতে যায়। তার বিবরণে ওরাওঁদের মেজাজ আর মানসিকতা ধরা পড়েছে : 'মুরমা গ্রামের অধিবাসীরা আমাকে বলে, ওরাওঁরা ঠিক করেছে, নেতাদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা জমায়েত ছেড়ে যাবে না; তাদের বিশ্বাস, জার্মান রাজ কায়েম হয়ে গেছে; ব্রিটিশ এবং জমিদারেরা সব ক্ষমতা খুইয়েছে; ...ওরাওঁদের দেখে মনে হল, এক তীব্র চাপা উত্তেজনায় তারা গম্ভীর হয়ে আছে; এ অবস্থায় তাদের কিছু বোঝানো সম্ভব নয়।' পনেরো শ টাকার জামিন জোগাড় হলে নেতারা সাময়িকভাবে জেল থেকে ছাড়া পাবে—আদালতের এ নির্দেশ এলে ওঁরাওরা জামিনের ব্যবস্থাও করে। পুলিশ রাজি হল না; বলল, জামিনদার যথেষ্ট বিত্তশালী নয়। ক্ষুব্ধ ওরাওঁদের হাবভাব দেখে স্থানীয় প্রশাসন প্রমাদ গুনল, ১৮৯৫ সালে বীরসার গ্রেপ্তারের পর যে ধরনের 'ভয়াবহ বিক্ষোভ' হয়েছিল, এখানেও তা ঘটতে পারে।

পরিষ্কার বোঝা যায়, শিবুর অনুপস্থিতিতে আন্দোলনের নেতৃত্ব ক্রমেই চরমপন্থীদের হাতে চলে যায়। ৩১ মার্চ দুই নতুন নেতা, সোমা ওরাওঁ এবং গোঁসাই ওরাওঁ, প্রকাশ্যে ঘোষণা করে : 'দেশের শাসনভার এখন তাদের হাতে'। অভিযুক্ত হওয়ার পর [তাদের একজন] 'আদালতে মুকুট পরে আসে।' তাদের রাজদ্রোহিতায় কোনো গোপনীয়তা ছিল না।

এপ্রিলের শেষে 'এক বাজারের দিনে টোটা-বাজারে এক বড়ো সমাবেশে তারা বলল, দেশের কর্তৃত্ব এখন ওরাওঁদের হাতে এসে গেছে; তাদের আইন এবং নির্দেশ না মানার পরিণাম হবে খুব খারাপ'। গুমলা সাব-ডিভিশনের প্রধানকে তারা ওরাওঁ-রাজ প্রতিষ্ঠার কথা জানাবে বলে দলবল নিয়ে যায়।

মে মাস থেকে আন্দোলন নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, তার উপর কেন্দ্রীয় কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আন্দোলনে তিন ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। তবে কোনোটাই সব সময় একই রকম থাকে নি। আন্দোলন এক ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হল; কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ে এ লক্ষ্যই পালটে গেল। লক্ষ্য এবং উপায়—এ অস্থিরতা এ-সময়কার ওরাওঁ আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য।

আন্দোলনের তিনটি ভিন্নমুখী ধারা হল: ধর্ম-সংস্কার বিষয়ে নূতন উদ্দীপনা; সহিংস-পন্থায় হৃত-জমি উদ্ধারের সংঘবদ্ধ চেষ্টা; এবং আস্তে-আস্তে এ পন্থা ছেড়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে লক্ষ্যসিদ্ধির সংকল্প।

প্রথম ধরনের আন্দোলনের নেতা তুরিয়া ভগৎ। টানা ভগৎ-আন্দোলনের মূল বিশ্বাসগুলির কথা আবার সে বলল। তা ছাড়া, তার প্রচারে হিন্দুধর্মের কিছু প্রভাবও লক্ষ করা যায়। শিবু ওরাওঁ-এর আন্দোলনের আগে মুসলমান-বিদ্বেষ বড়ো একটা দেখা যায় না। শিবুর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, 'মুসলমানেরা গোরু জবাই করে; তাই তাদের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে'। তুরিয়ার প্রচারেও এ মনোভাব সুস্পষ্ট। তার একটা ঘোষণা হল: ভগবানের নির্দেশে গোরু এবং মোষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। দক্ষিণ-বিহারের কোনো-কোনো অঞ্চলে তখনকার গো-রক্ষা-সমিতির আন্দোলনের প্রভাব হয়ত এখানে ছিল। তাছাড়া, হিন্দুধর্মের প্রভাবের আর-একটা নূতন দিক, তুরিয়ার শিষ্যেরা ওরাওঁদের পৈতে নিতে বলেছিল।

এ আন্দোলনেও রাজনীতির সুর ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠে। দুটো সাম্প্রতিক সরকারি ব্যবস্থার বিরোধিতায় তারা নামে—চৌকিদারি ট্যাক্সো আর টীকাদান। তাদের কারো-কারো ধারণা হয়, ওরাওঁ-দের রসদ যোগানোর জন্য পুলিশ আর জমিদারকে হুকুম করার অধিকার তাদের আছে। অবশ্য এ হুকুম যখন মানা হল না, তারা প্রতিবাদ করে নি।

আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারা, জোরজার করে হারানো জমি উদ্ধার করা। এটা সম্পূর্ণ নূতন এক প্রবণতা। জুলাই মাসে কয়েকজন জমিদার পুলিশকে জানায়, নূতন এক নেতা জুরা ভগতের শিষ্য চাঁদা ওরাওঁ এবং অন্যান্যরা জোর করে তাদের জমি থেকে ফসল কেটে 'চুরি' করে নিয়ে গেছে। ওরাওঁদের আত্ম-পক্ষসমর্থনের ভঙ্গি থেকে তাদের মানসিকতা পরিষ্কার বোঝা যায়। তারা বলে, ফসল তুলে জমিদারকে না বলে বাড়ি নিয়ে যাওয়া মোটেই অপরাধ নয়; কারণ জমি তাদের; ছোটনাগপুরের মহারাজা থেকে পাওয়া এ জমি জমিদারেরা কৌশলে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। আদালত তাদের দাবির আইনগত ভিত্তি জানতে চায়। যে একটিমাত্র দলিল তারা পেশ করতে পারল—তা হল, জমিটার বেদখলের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে জুরা ভগতের আর্জি। সে আর্জি বিষয়ে ছোটলাট কোনো সিদ্ধান্ত কিন্তু তখনো নেয় নি। রাজস্ব-বিভাগকে এ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বলা হয়েছিল মাত্র। শুধুমাত্র এ মন্তব্য থেকেই জুরা ভগৎ ধরে নিয়েছে, মামলার নিষ্পত্তি ওরাওঁদের পক্ষে গেছে।

২৮শে সেপটেম্বর লোহারডাগা থানা অঞ্চলে এ ধরনের আর-একটা ঘটনা ঘটে। সাতাশজন টানা ভগৎ এক জমিদারের ফসল কেড়ে নেয়, তারা প্রকাশ্যে বলে, দেশের শাসনভার এখন তাদের হাতে এসে গেছে। খোঁজ নিয়ে পুলিশ জানল, বলদেও সিং বিড়লা নামে এক জমিদার সম্প্রতি সে গ্রামের মালিকানা পেয়েছে।

স্বভাবতই, প্রচলিত আইনমতে ওরাওঁদের দাবি গ্রাহ্য নয়। কিন্তু তারা এ আইনকেই স্বীকার করে

না। তাদের দাবির ভিত্তি নৈতিক, আইনগত নয়। এ জমি তারা বহু পুরুষ ধরে চাষ করে আসছে; অথচ জমিদারের ছলাকলায় তারা দীর্ঘদিনের এ অধিকার হারিয়েছে; আর জমিদার আদালত মারফত তা বৈধ করে নিয়েছে। তারা এ হারানো জমি উদ্ধার করতে চেষ্টা করছে মাত্র। কিন্তু ব্রিটিশ রাজকে মানলে তার আইনকেও মানতে হবে। কিন্তু ওরাওঁদের আইনের ওপর টানা ভগৎ-আন্দোলনের একটা প্রভাব স্থায়ী হয়ে গেছে: তা হল ওরাওঁ-রাজ এসে গেছে, বা তার প্রতিষ্ঠা আসন্নপ্রায়। আদালতে তারা বলল; তখনকার আইনমতে গ্রামের মালিকানা অন্যজনের হাতে গেলেও আসল অধিকার তাদেরই; কারণ দেশের শাসনভার তাদের হাতে এসে গেছে।

বলাই বাহুল্য, পুলিশি দাপটে এ ধরনের আন্দোলন বেশিদিন টিকতে পারে নি। তাই ১৯১৯-এর শেষের দিকে দেখা যায়—আন্দোলনে হিংসার ভূমিকা ক্রমেই গৌণ হয়ে আসছে।

কিন্তু লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় যাই হোক, তাদের মূল লক্ষ্যে কোনো পরিবর্তন আসে নি। স্বাধীন ওরাওঁ-রাজের স্বপ্ন বার-বার উজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছে; তাদের ধর্মবিশ্বাস, আচার, সামাজিক রীতিনীতি তারা আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছে, এ বিশ্বাসে যে স্বাধীন রাজের প্রতিষ্ঠা তাতে ত্বরান্বিত হবে।

১৭ই ডিসেম্বর কুরু থানার অন্তর্গত টিকো গ্রামের এক জমায়েতে তাদের ঘোষণাকে এ বিশিষ্ট মানসিকতার দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। তারা সেখানে বলে, তারা সবাই শিবু ওরাওঁ-এর শিষ্য। পুলিশাধ্যক্ষের রিপোর্টে এ ঘোষণার সারমর্ম দেওয়া হয়েছে:

'তাদের বিশ্বাস সে [শিবু] আবার তাদের কাছে ফিরে আসবে; দুনিয়াটা তারই অধিকারে; ব্রিটিশ সরকার দেশের শাসনভার তার হাতে তুলে দেবে।

'তারা জমিদারকে কোনো খাজনা দিতে রাজি নয়; তারা অবশ্য বলছে, জমিদার বাতাই (ভাগচাষের) এর ভিত্তিতে জমি চাষ করতে পারে।

'তারা চৌকিদারি ট্যাক্সো দেবে না।

'তাদের পুত্রকন্যাদের তারা টীকা নিতে দেবে না; কারণ তাদের ধর্মমতে রক্ত দেখা নিষিদ্ধ।

'কারও প্রতি হিংসা-প্রয়োগ তারা করতে চায় না। তুরিয়া ভগতের নির্দেশে তারা রসদ যোগানোর জন্য হুকুম জারি করেছিল। কিন্তু এ দাবি মেনে নেওয়ার উপর তারা আর জোর দেবে না।

'ওরাওঁ-রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের সঙ্গে যুক্ত ছিল ওরাওঁ-ইতিহাসের সব গৌরবময় স্মৃতি ও গাথার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা।

'টিকো গ্রামে যে জায়গায় জমায়েত হয়েছিল, তার কাছে ছিল এক কবর; ভগৎরা প্রতিদিন তাতে জল দেয়; তারা বলছে, প্রায় একশ বছর আগে জমিদারেরা বহুসংখ্যক ওরাওঁদের নির্মমভাবে খুন করে; এ কবর তাদের একজনের; জল ঢেলে তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের আত্মাকে ফিরিয়ে আনবে।'

[ক্রমশ

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

২৯৩. Sarat Chandra Roy, *Oraon Religion and Customs*. (Reprint; Edition Indian, Calcutta 1972), Ch. VI.

২৯৪. ১৯১৪ এবং ১৯১৫ সালের আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য—একই, পৃ ২৪৬-২৫০.

২৯৫. এ আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নলিখিত সরকারি দলিলগুলি দ্রষ্টব্য:

(ক) India Home (Political) Deposit, Sept. 1915. Prog. no. 58

(খ) ,, ,, ,, ,, , Dec. 1915. Prog. no. 25

(গ) ,, ,, ,, ,, , Oct. 1915. Prog. no. 36

(ঘ) ,, ,, ,, ,, , April, 1916. Prog. no. 18

(ঙ) ,, ,, ,, ,, , June, 1916. Prog. no. 2

(চ) ,, ,, (Political Progs.) June, 1916, Progs. no. 280-281/A.

২৯৬. একই (চ)

২৯৭. একই

২৯৮. এ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন K. S. Singh : *Tribal Society in India*. (Monohar, New Delhi, 1985) ; Pp-159-160.

২৯৯. এ আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আমার প্রধান সূত্র : Govt. of Bihar and Orissa, Political Dept., (Special) ; File No. 86 of 1919 ; Pp 1-45.

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণে ধারাবাহিক রচনা "বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি" এই সংখ্যায় ছাপা সম্ভব হল না বলে আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক

তাসের দেশের অচলায়তন

পিনাকী ভাদুড়ী

১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসে, অর্থাৎ ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথ "একটি আষাঢ়ে গল্প" নামে যে গল্পটি লিখেছিলেন, সেইটি নিয়েই তিনি বহুদিন পরে ১৩৪৫ সালে, অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে লিখলেন "তাসের দেশ"। যেন গল্পটির নাট্যরূপ দেওয়া হল, তবে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে বিষয়টির পরিবর্ধন পরিবর্জন ঘটে গেল অনেকটা। গল্পটি পড়ে যতটা খেয়ালের বশে লেখা বলে মনে হয়, আসলে তা ছিল না। নইলে চল্লিশ বছর পরেও, মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে আবার এই বিষয়টিকেই কবি উপজীব্য করতেন না। সমাজের জড়তা তাঁকে তাহলে এতদিন ধরে হানা দিয়ে ফিরছিল। গল্পটা সেক্ষেত্রে মনে হবে একটা খসড়া মাত্র। যেন একটা রূপকথা লেখার চেষ্টা করছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই আদ্যিকালের রাজপুত্র, দুয়োরানী, সদাগরপুত্র—এসব নিয়েই গল্পটি ভাবা হয়েছে। দুয়োরানীর দারিদ্র্য ছিল, রাজপুত্র তাই মায়ের দুঃখ দূর করার জন্যই বিদেশে বেরোল। মাকে বলে গেল, 'এবার তোমার দুঃখ-মোচনের উপায় করিয়া আসিব।' ঠিক যেমনভাবে সব রূপকথার রাজপুত্ররা বেরিয়েছে, মা অপেক্ষা করে থেকেছেন ছেলের ফিরে আসার জন্য, ছেলে ফিরে এসেছে শুধু ধনদৌলত নিয়ে নয়, এসেছে একটি সুন্দরী বউকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সাহিত্যধর্ম" প্রবন্ধেও বলেছেন, 'রাজপুত্র···অর্থশাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি—তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, বোধ করি চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তরের মাঠ।'

ভ্রমণে বেরিয়ে যেমন হয়ে থাকে, রাজপুত্র একটু বিপদে পড়ল। কোনো ষড়যন্ত্রের শিকার হল না বটে, তবে সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে তার নৌকো ভেঙে তাকে এনে ফেলল একটা অজানা জগতে। এই পর্যন্ত গল্পটা এগোয় রূপকথার প্যাটার্নে, কিন্তু এর পরে বদলে যায় ধরনটা। শঙ্খদ্বীপের শঙ্খ, চন্দনদ্বীপের চন্দন, প্রবালদ্বীপের প্রবাল ইত্যাদি সম্ভারে নৌকো পূর্ণ করে যখন তারা ঝড়ের মুখে পড়ল, তখন নৌকো-ডুবি হয়ে রাজপুত্র, কোটালপুত্র এবং সদাগরপুত্র এসে

পৌঁছল তাসের রাজ্যে।

এইবারে গল্পটা আধুনিক হয়ে উঠল। ঘুচে গেল রূপকথার রাজত্বের রহস্যময় দূরত্ব। এ রাজ্যে মানুষ নেই, তাস আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্য দিয়ে মানুষের অপূর্ণতার ব্যথা এবং পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে বসলেন।

তাসের যে রাজত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সেখানে কারো কোনো ইচ্ছার দাম নেই, প্রত্যেকেই নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। ইচ্ছা বলতে কী বোঝায় তাই এরা জানে না। এজন্য তারা প্রশ্ন করে—'ইচ্ছা! সে ব্যাটা আবার কে?' রাজপুত্র এবং তার সঙ্গীরা এদের দেখে সকৌতুকে হেসে উঠল এবং সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হল তাসের রাজ্যের অধিবাসীদের বুকে। তাসের বিবি একদিন রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধ কটাক্ষপাত করে তাকে চমকিত করে দিল। শুধু তাই নয়, ভুল হতে লাগল বিবির নিয়মবাঁধা কাজে। যখন তাঁর গোলামের পাশে দাঁড়াবার কথা, তখন সে রাজপুত্রের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। রাজপুত্র অবশ্য ভুলটা উড়িয়ে দিয়ে বলে, 'আজ হইতে আমিই গোলাম।'

মোটামুটি এই বিষয়কেই সম্প্রসারিত করে রবীন্দ্রনাথ "তাসের দেশ" লিখবেন ১৯৮৮ সালে। কিন্তু তার অনেক আগেই, ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এই বিষয় নিয়েই লিখেছেন "অচলায়তন" নামে আর-একটি নাটক। দুটি নাটকের প্রকরণে অনেক তফাত আছে, এদের এক পঙ্‌ক্তিতে বসানো ঠিক হবে কিনা, তা নিয়ে তর্ক হতে পারে, কিন্তু দুটির বিষয়গত মিল আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না। "অচলায়তনে" নিয়মের নিগড়ে বাঁধা মানুষদের অসহায়তার কথা বলা হচ্ছে, শেষকালে সেই নিগড় ভেঙে বেরিয়ে আসছে আশ্রমিকের দল। "তাসের দেশ"-এ সেই নিময়, সেই ল অ্যান্ড অর্ডার। এতে অবশ্য পরিবেশনার ভঙ্গি সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছে। কিন্তু সে কথা পরে হবে। ল অ্যান্ড অর্ডার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সভ্যতার সঙ্কটে"ও ঘোরতর প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। তাঁর রোগশয্যা থেকে মিস র‍্যাথবোনকে যে কঠোর চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার মধ্যেও বলেছিলেন, 'Shall we then be grateful to the British, if not for keeping us fed, at least for preserving law and order?'

"অচলায়তন" নামেই পরিষ্কার যে এই আয়তনটি অচল; মনের দিক থেকে, হৃদয়ের দিক থেকে। এখানে সকলেই নানারকম পুঁথিগত প্রথা মেনে চলে, যদি কোথাও কারো ভুল হয়ে যায়, তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। পঞ্চক এ-সমস্ত প্রাণহীন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, তবে সে প্রতিবাদকে ঠিক প্রতিবাদ বলা চলে না বোধহয়। কারণ পঞ্চক বিরুদ্ধতা করার মতো জোর দেখায় না, শুধু তির্যক ভঙ্গির বাগ্‌ধারা ব্যবহার করে এইসব নিয়মকানুনকে যে সে অমান্য মনে করে, এইটে বুঝিয়ে দেয়। পঞ্চকের মধ্যে রয়েছে একটি কবিজনোচিত ভাবপ্রবণতা। নাটক শুরু হয় তার যে গান দিয়ে, সেই গানে সে বলে, 'মন যে কাঁদে আপনমনে, কেউ তা মানে না।'

"অচলায়তনে"র মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম—এই তিনটি মার্গেরই আবাসন গড়ে উঠেছে। এখানকার আশ্রমিক, শোনপাংশু এবং দর্ভক—এই তিন শ্রেণী ওই তিনটি মার্গের প্রতিনিধি। নাটকে রবীন্দ্রনাথ কিছু-কিছু প্রথা এবং মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন, তাদের উৎস সম্ভবত রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal বইটি। এই বইটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। ১৮৯০ সালে ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতেও এই বইটির কথা লিখেছেন। ওই গ্রন্থে যেসব ধারণী-মন্ত্রের উল্লেখ আছে, সেগুলি হল—ধ্বজাগ্রকেয়ূরী, মারীচি, মহামারীচি, পর্ণশবরী, উষ্ণীষবিজয়, শৃঙ্গভেরি। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় এই নামগুলিই ব্যবহার করেছেন। এইসব মন্ত্র অমঙ্গল নিবারণের আশায়

বা অভীষ্ট ফললাভের ইচ্ছায় আবৃত্তি করা হত বা কবচে লিখে ধারণ করা হত। শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে এই অভিযোগে "অচলায়তনে"র বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন অক্ষয়কুমার সরকার এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিক দিক থেকে নয়, সামাজিক দিক থেকে। ললিতবাবু ১৩১৮ সালের কার্তিক সংখ্যা "আর্যাবর্তে" প্রশস্তি ও তিরস্কার দুই-ই করেছিলেন। তিরস্কারটুকু এইরকম, 'রবীন্দ্রনাথ সমাজ ভাঙিতেছেন, মন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছেন।' রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে, সেই বিশ্বাস যখন মনকে পাইয়া বসে তখন আর সে ঐ শব্দের উপরে উঠিতে চায় না। ক্রমে দাঁড়ায় এই যে মন্ত্র পড়িয়া···নানারকম নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে।'

ললিতবাবুকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা।····· ইহাই শ্রেয়স্কর।·· অচলায়তনে আমার বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে।'

নাটকের শেষে এই অচলায়তন ভেঙে পড়ে, সেইটেতেই কবির আশা। এই পুঁথিপড়া রীতের শিকল ভেঙে যাবে, রবীন্দ্রনাথ এই আশাই করেছেন। "অচলায়তন" নাটকের গোড়ায় সুভদ্র নামে একটি বালকের তথাকথিত পাপকর্মের বিবরণ আছে। সে ওই শিবিরের উত্তর দিকের জানলা খুলে তাকিয়েছিল। উত্তর দিক ছিল সবার কাছে নিষিদ্ধ। এই পাপের ভয়ে আর সকলে তো বটেই, স্বয়ং সুভদ্র বালক হলেও নিজেই এর প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য প্রস্তুত। তিনশো বছর সে জানলা কেউ খোলে নি, এমন পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধানও সবার জানা নেই, পুঁথি ঘেঁটে তা খুঁজে বার করতে হবে। শুধু পঞ্চক সুভদ্রের এই কর্মকে কীর্তি বলে অভিহিত করতে চায়। পাপ নয়, সুভদ্র এই কাজে তার বীরত্বই দেখিয়েছে; পঞ্চক সুভদ্রকে বাহবা দিয়ে বলে, 'তিনশো বছরের আগল তুই ঘুচিয়েছিস।'

"অচলায়তন" নাটকটিকে আরো অভিনয়যোগ্য করার জন্য ১৯১৭ সালে "গুরু" নাটকটি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। এ নাটকের শেষে সুভদ্রের ওই পাপকে গুরু যে মুহূর্তে স্বীকার করে নেন, সেই মুহূর্তেই নাটকের সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। "অচলায়তন" নাটকের সমাপ্তি আর-একটু প্রলম্বিত। সেদিক থেকে "গুরু" নাটকে বিষয়টি আরো টানটান করে বাঁধা হয়ে যায়। গোড়ার পাপবোধ থেকে এগিয়ে এসে পাপের ধারণাটাকেই ভেঙে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয় নাটক।

"অচলায়তনে"র অন্যতম প্রধান চরিত্র মহাপঞ্চক—পঞ্চকের দাদা। আশ্রমের একজন কঠিন মানুষ। শাস্ত্রের কাছে সে মানুষকে বলি দিতে পারে অনায়াসে। তার মন শুষ্ক, কিন্তু নিষ্ঠাবান। সেখানে কোনো তরুকতা নেই। যখন আশ্রমের আচার্য সুভদ্রের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলেন, তখন মহাপঞ্চক বিচলিত হয়ে উঠল। সে এতদূর পর্যন্ত স্থির করল যে আচার্যকে সরিয়ে দিয়ে উপাচার্যকেই বসাবে আচার্যের আসনে। একেবারে "ক্যুদেতা"র পরিকল্পনা। কিন্তু এর মধ্যে নিজের কোনো লাভের লোভ নেই। এইজন্যই যখন গুরুদেব এসে দাঁড়ালেন, ভেঙে ফেললেন সমস্ত প্রথার বাঁধন, তখনও মহাপঞ্চক প্রাণপণে তার বিরুদ্ধতা করল। তার তপস্যা প্রাণহীন, কিন্তু নিষ্ঠাহীন নয় বলেই সে বিপদের মুখে চ্যালেনজ ছুঁড়তে ভয় পায় নি। এ নাটকে মহাপঞ্চক প্রথার নির্বিকারত্বই পার্সোনিফাই করে।

"অচলায়তনে"র প্রাচীর ভাঙার কাজে বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল শোনপাংশুদের দল। এরা বাইরের লোক, এবং ছোটো জাত। কোনো রীতি মানে না, কিন্তু জীবনকে উপভোগ করে। এরাই ধুলোয় মিশিয়ে

দিল প্রাচীর, এনে দিল আলোর প্রবাহ। চুরমার হয়ে গেল অচলায়তন। নাটকে দর্ভক নামে একদল মানুষকে দেখা যাবে, যারা মন্ত্র জানে না, গান গাইতে জানে। জীবনকে এরা সহজ করেছে, কঠিন করে নি। শোনপাংশু এবং দর্ভক, এই দু-দলের জীবনবোধ সাঁড়াশি আক্রমণে অচলায়তনকে পরাজিত করে। "গুরু" নাটকে একটি গান গাওয়া হয় শেষকালে—'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়।' গানটি সাধারণত অনেক অনুষ্ঠানেই আমরা গেয়ে থাকি, এটিকে বিশেষ করে শুধু প্রথাবিরুদ্ধতার গান বলেই মনে করবার কোনো কারণ নেই। তবু 'জীর্ণ আবেশ' বলতে যদি রবীন্দ্রনাথ নিষ্প্রাণ রীতিকে বোঝাতে চেয়ে থাকেন, তবে তাতেও আপত্তি করবার কিছু নেই। অর্থাৎ গানটি অনেকটাই নির্বিশেষ। তবু 'বন্ধন হোক ক্ষয়' কথাটিকে যদিও-বা নাটকের বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়, 'মৃত্যুর হোক লয়' পঙক্তিটি বোধহয় অত স্পেসিফিক হতে পারে না, একটু কাব্যিক ভিস্যুয়ালাইজেশন হয়ে ওঠে। "তাসের দেশ"-এর আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে সমাপ্তিসংগীত কতটা বিশেষত্ব পেতে পারে।

শুধু সমাপ্তিসংগীতই নয়, "তাসের দেশ"-এর পরিকল্পনাটাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর মধ্যে অবশ্য বিশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে, রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায় এসেছে গভীরতা, সৃষ্টিক্ষমতায় গড়ে উঠেছে নতুন অর্থময়তা। বিষয়বস্তু এক হলেও পরিবেশন হল সম্পূর্ণ নতুন।

"তাসের দেশ"-এর কাঠামো "একটি আষাঢ়ে গল্পে"র আদল থেকেই নেওয়া, কিন্তু অনেক তফাত ঘটে গেছে। গল্পটিতে রাজপুত্র ছিল দুঃখিনী দুয়োরানীর ছেলে, মূলত মায়ের দুঃখমোচনের জন্যই সে বেরিয়ে পড়েছিল। "তাসের দেশ"-এর রাজপুত্র কিন্তু পার্থিব অর্থে মোটেই দুঃখী নয়, তার অভাব হল—'অভাবেরই অভাব।' ব্যক্তিগত অভাববোধকে রবীন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করেছেন, কারণ তিনি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করবেন মানুষের জীবনযাত্রার প্রাণহীনতার উপরে। এখানে রাজপুত্র বিদেশে বেরিয়েছে নতুন কিছু পাবে বলে। তার নিজের জীবনের পুনরাবৃত্তিতে সে অধীর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পথে বেরিয়ে নৌকাডুবি হয়ে যে-দেশে সে গিয়ে পড়ল, সে দেশ আরো বেশি নিয়মের বেড়াজালে বন্দী। "তাসের দেশে"র পটে আঁকা সাহেব-বিবিরা যে প্রাণহীন, সেকথা রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমার হালদারের "বাগগুহা ও রামগড়" গ্রন্থের আলোচনাতেও বলেছিলেন, '...প্রত্যক্ষ করেছি যে তখনকার কালের মানুষরা তাসের সাহেব-বিবি ও গোলাম ছিল না। তখন বৈরাগ্যের শক্তি বড়ো ছিল, কেন না রাগ-অনুরাগের শক্তি সজীব ছিল।' এই 'অনুরাগের শক্তি'ই হল "তাসের দেশ" নাটকের মর্মকথা।

"একটি আষাঢ়ে গল্প" এখানে রূপান্তরিত হয়েছে নাটকে, "অচলায়তনে"র গাম্ভীর্য ভাঙা হয়েছে সরসতার আঘাতে। যেমন বরফ গলে ঠাণ্ডা জল নদী হয়ে কূলে-কূলে সজীবতা এনে দেয়, "তাসের দেশ" তেমনি সহজে সজীবতার জোয়ার এনে দিল। এদেশেও নিয়মের কঠোরতাকে ভেঙে দিল জীবন।

"অচলায়তন" এবং "তাসের দেশ"-এ প্রথার বিরুদ্ধে যে কটাক্ষ তার মধ্যে খুব স্পষ্ট মিল আছে। নিজেদের কুলের কথা বলতে গিয়ে পঞ্চক বড়ো গলায় বলছে, 'আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।' "তাসের দেশ"-এ ছক্কা তার নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছে, 'ব্রহ্মা···প্রথম যে হাই তুললেন পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্ভব।' এর উত্তরে সদাগর পুত্র ঠাট্টা করল, 'পিতামহ ব্রহ্মা··· কামানের মতো আওয়াজ করে হেঁচে ফেললেন—সেই বিশ্ব-কাঁপানি হাঁচি থেকেই আমাদের উৎপত্তি।'

যেসব প্রথা অচলায়তনিকদের ঘিরে রেখেছে, তার সঙ্গে "তাসের দেশ"-এ অনুসৃত রীতির মিলটাও উল্লেখযোগ্য। "তাসের দেশ"-এ ছক্কা যেখানে বলে, 'বাহুড়ে-খাওয়া গাবের আঁঠি পুড়িয়ে তিন দিন চোখে

কাজল পরতে হবে, তবেই স্বর্গে পিতামহদের উপোস ভাঙবে', "অচলায়তনে"পঞ্চক সেখানে দীপকেতনপূজা করতে যায়, যাতে 'মাটিতে ছোটো-ছোটো মন্দির গড়ে তার উপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হবে। এমন হাজারটা গড়ে তবে সূর্যাস্তের পরে জলগ্রহণ', এবং এরই ফলে 'প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে।' দেখা যাচ্ছে, উভয় ক্ষেত্রেই পরলোকে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে ব্রতপালন করা হচ্ছে। আমাদের বর্তমান জীবনকে অস্বীকার করে মৃত অতীতের দিকে এই পিছু ফিরে চাওয়ার ধারাটিকে রবীন্দ্রনাথ দুটি নাটকেই বিদ্রূপ করেছেন।

"অচলায়তনে" যেটা ছিল না, "তাসের দেশ" সেই ঘাটতিটা পূরণ করে দিল। "অচলায়তনে" কোনো নারী ছিল না, "তাসের দেশে"-এ নিয়মভাঙার আহ্বানে প্রথম সাড়া দিল নারীরাই। রূপকথার এই আধুনিক অপরূপকথার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে এলেন বিদ্রূপ, নিয়ে এলেন প্রেম। এ নাটকের চরিত্রগুলো তাসের মুখোশ পরে অভিনয় করতে নামে। কেউ-কেউ বলেছেন যে মুখোশ পরলে তাসের শ্রেণীবিভাগটা সহজবোধ্য হবে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন এ নাটক অভিনয় করেছিলেন, সে সময়কার ছবিতে দেখতে পাই যে চরিত্রগুলো মুখোশ পরেছে বটে। আমাদের কিন্তু মনে হয় পোশাকের মধ্যে তাসের চেহারাটা রাখলেও মুখোশ পরার দরকার নেই। কারণ তাতে তাসের শ্রেণীবিভাগ হলেও, ব্যক্তিগত চরিত্রের কম্পন ধরা পড়ে না। এতে উদ্দেশ্যের বিপরীতে যাওয়া হবে। মনে হবে চরিত্রগুলো আইডিয়ার মুখোশ পরে আছে। আমাদের লক্ষ্য কিন্তু আইডিয়া নয়, মানুষ; ধারণা নয়, জীবন। যখন তাস-রমণীরা তাদের তাসজন্মের বিফলতাকে নিজেরাই কেউ-কেউ বিদ্রূপ করছে, তখনকার সংলাপ লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই কথোপকথন চূড়ান্তভাবে মানবিক। যাকে আমরা বলি ঠেস দিয়ে কথা বলা, তার উদাহরণ এতে রয়েছে:

'চুলে যে রাঙা ফিতেটা জড়িয়েছ ঐ ফিতে দিয়ে তাসের দেশের আচার বিচার গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। এত বড়ো বেহায়াগিরি তাসরমণী হয়ে!'

'তা হয়েছে কী। আমি ভয় করিনে কাউকে···

ঐ-যে আমাকে টিট্‌কারি দিতে এসেছে···'

'অত গুমোর কোরো না গো কোরো না—জান? তোমাকে জাতে ঠেলবে বলে কথা উঠেছে।'

'তাসের জাত তো, আমি তা নিজের হাতে জলাঞ্জলি দিয়েছি···'

'সর্বনাশ! এমন ধাষ্টমির কথা তো সাত জন্মে শুনিনি।···চল্ ভাই,···কে কোথা থেকে দেখবে ওর সঙ্গে কথা কচ্ছি, আমাদের শুদ্ধ মজাবে।'

বেহায়াগিরি, টিটকারি, গুমোর, ধাষ্ট মি—এসব শব্দ আসছে একেবারে মাটি থেকে। বোঝাই যাচ্ছে, ভেতর থেকে বদল ঘটছে বলেই কথার মধ্যে আসছে এমন তীক্ষ্ণতা।

এইসব পরিবর্তনের পরে অবশ্যম্ভাবী যা ঘটল তা হল হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব। রমণীর প্রসাধনে এখন বেলা বয়ে যায়:

'আমি তখন চুল বাঁধছিলুম। থাকতে পারলুম না।···'

'আশ্চর্য করলে। চুল বাঁধা! এ বিদ্যে কে শেখালে!'

'কেউ না। ঐ দেখো না, এবার হঠাৎ শুকনো ঝরনায় নামল বর্ষা। জলের ধারায় ধারায় শুরু হল বেণীবন্ধন। এ বিদ্যা কে শেখাল তাকে।'

আমাদের মনে পড়ে যায় "লিপিকা"র 'ভুল স্বর্গ' রচনাটি। ১৯২২ সালে লেখা। এর মধ্যেও মেয়েটিকে বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দিয়েছিল বেকার যুবক। তখন থেকে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। 'কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।' এই স্বর্গও ছিল কেজো লোকের স্বর্গ। কোথাও ফাঁক ছিল না, কোনো অসুখ হত না। সেখানেও এল নতুন লোক, যে ভেঙে দিল নিয়মের শাসন। "তাসের দেশ"-এও তাই হল, নিয়ম ভেঙে মেয়েরা প্রসাধনে

সময় দিতে শুরু করল। এই প্রসাধনই মেয়েটির প্রেমালাপ, যে আলাপ সে অজানা কোনো মানুষের সঙ্গে করতে চায়। "বিচিত্রিতা" কাব্যের 'একাকিনী' কবিতায় প্রসাধনকলা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন।

ক্রমশ তাসের দেশে শুরু হল ইচ্ছাসুখের আবর্তন। "একটি আষাঢ়ে গল্পে" প্রশ্ন উঠেছিল ইচ্ছা? সে বেটা আবার কে? "তাসের দেশ" নাটকে তার উত্তর শোনা গেল—ইচ্ছে। সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে। ইচ্ছের অভিঘাতে সমগ্র তাসদ্বীপ নড়ে উঠেছে, তাসের রাজা বলেছে, সর্বনাশ! কিন্তু রাজপুত্রের কাছে সকলেই ইচ্ছামন্ত্রে দীক্ষিত। "পরিশেষে"র 'রাজপুত্র' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

এতদিন
আত্মপরিচয়হীন
জড়তার পাষাণপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গমাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যরা।
কোন্ মন্ত্রগুণে
সে দুর্ভেদ বাধা যেন দহিলে আগুনে।

এ নাটকেও রাজপুত্র প্রথার প্রাচীর ভেঙে দিল। "অচলায়তনে" প্রাচীর ভেঙে দিয়েছিল শোনপাংশুর দল। মানুষ হিসেবে যারা ম্লেচ্ছ, অচ্যুত। "তাসের দেশ"-এ আঘাত হানল বিদেশী রাজপুত্র। দুটো নাটকেই এই ধাক্কাটা আসছে বাইরে থেকে। কেউ-কেউ এ সম্পর্কে বলেন যে প্রতীচ্য-সভ্যতার অভিঘাত-এর কথা রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন। মনে না করলেও, এ ধরনের ব্যাখ্যা হতেই পারে। ক্লাসিক সাহিত্য আলোচনার এটাই ধর্ম। এলিয়ট তো শেক্সপীয়ার প্রসঙ্গে বলেছিলেন—We must understand those things, which Shakespeare did not understand himself। এই ধারণা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাও অসম্ভব নয়।

তথাপি এই দুটি নাটকের তুলনা করলে মিল এবং অমিল দুটোই দেখতে পাওয়া যাবে।

"অচলায়তন" নাটকে পঞ্চক এবং শোনপাংশুদের সংলাপ মনে করে দেখা যাক। পঞ্চক তাদের যে বিধি-নিষেধের কথা বলছে, শোনপাংশুরা ঠিক সেই নিষেধের কাজগুলোই পরম যত্নে করে থাকে। অথচ তারা তো ভালোই আছে। চাষের কাজ, লোহার কাজ সব করে তারা। কোনো মন্ত্রতন্ত্র তারা জানে না। দু-একটি উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে ব্যাপারটা।

পঞ্চক—সত্যি করে বলিস, তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

শোনপাংশু—খুব করি।
আমরা লোহার কাজ করি, তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।···

পঞ্চক—তোরা এখনও কোনো দিক থেকে কোনো কোপে পড়িসনি?

শোনপাংশু—যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে, তারও কোপ বড়ো কম নয়।···

পঞ্চক—···সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়ানৌকোয় উঠতে পারিস?

শোনপাংশু—খুব পারি।

পঞ্চক—ওরে···আমি আর থাকতে পারছি নারে।···
এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তাহলে ···আমার জাতমান কিছু থাকবে না।

সংলাপের অংশটিকে অন্ধরীতি এবং তার বিরুদ্ধতা জোরালো ভাবেই দেখানো হয়েছে। "তাদের দেশ"-এও এই একই বিষয়, তবে তার ভাঙ্গ আলাদা। কোনো প্রথার উল্লেখ করা হয়নি, কেবল সে সম্পর্কে অনিচ্ছার তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে তীক্ষ্ণ সংলাপে। যেমন—

রাজা—তোমরা যে···অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছ—জলে দিচ্ছ ডুব, চড়ছ পাহাড়ের মাথায়, কুড়ুল হাতে বনে কাটছ পথ—এসব কেন?

রাজপুত্র—রাজাসাহেব, তোমরা যে কেবলই উঠছ-বসছ, পাশ ফিরছ, পিঠ ফেরাচ্ছ, গড়াচ্ছ মাটিতে,

সেই বা কেন!

রাজা—সে আমাদের নিয়ম।

রাজপুত্র—এ আমাদের ইচ্ছে।

রাজা—ইচ্ছে? কী সর্বনাশ···ও কি রানীবিবি, তাড়া-তাড়ি উঠে পড়লে যে!

রানী—আর বসে থাকতে পারছিনে।

রাজা· রানীবিবি, সন্দেহ হচ্ছে, তোমার মন বিচলিত হয়েছে।

রানী—সন্দেহ নেই, বিচলিত হয়েছে।

রাজা—জান? চারুল্য তাসের দেশে সবচেয়ে বড়ো অপরাধ।

রানী—জানি, আর এও জানি, এই অপরাধটাই সবচেয়ে বড়ো সন্তোগের জিনিস।

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে পঞ্চক যেজন্য উত্তেজিত হয়েছিল, রানী হয়তো সেই কারণেই বিচলিত হয়েছে।

"অচলায়তন" এবং "গুরু"—দুটিরই শুরুতে 'তুমি ডাক দিয়েছ' গানটি আছে। "অচলায়তনে"-র শেষে কোনো গান নেই, "গুরু"র শেষে আছে 'ভেঙেছ দুয়ার', এই গানটি। এর কথা আগেই বলেছি।

"তাসের দেশ" শুরু হয় 'খর বায়ু বয় বেগে' দিয়ে। গানটি থীম মিউজিকের কাজ করে। গোড়াতেই একটা আলোড়নের সংবাদ দেয় এই গান। নাটক শেষ হয় 'বাধ ভেঙে দাও' গানের নৃত্যরূপের মধ্যে। সুরের প্রবল তাড়নায়, নাচের উদ্দামতায় ভেঙে যেতে থাকে সমস্ত জীর্ণতা। "অচলায়তনে" যে জীর্ণ আবেশের কথা বলা হয়েছে, তা ভেসে চলে গেল মাভৈ-মন্ত্রে।

'অচলায়তন' নাটকটি আমরা রূপকার এবং লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনায় দেখেছি। রূপকার গোষ্ঠী পঞ্চকের ভূমিকায় তাঁদের প্রধানা মহিলা-অভিনেত্রীকে পুরুষবেশে নামিয়েছিলেন। এ নাটকে মহিলা চরিত্র না থাকায় নাটকটি সরস হতে পারে না। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ এটিকে খোলা মাঠে পোস্টার ড্রামার ধরনে অভিনয় করতেন, যেখানে বলে দেওয়া হত যে অভিনেতাদের দেখতে না পেলেও চলবে, কথাগুলোই শুধু শ্রোতব্য। অর্থাৎ, দৈববাণীর মতো মেসেজ পাঠানো হত, বেতার নাটকের মতো স্বর-ক্ষেপণ ঘটত, চরিত্রের মুখচোখের ভাব দেখার দরকার ছিল না। এটি কোন প্রযোজনার পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য স্বীকৃতি কি না রসিক ব্যক্তি বলতে পারেন।

শেকসপীয়ারের নাটক শতাব্দীর পর শতাব্দী যেমন নানাস্থানে অভিনীত হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথের নাটক এখনো তা হয় নি। অভিনয়ের এতাবৎ ইতি-হাসে কবির অনেক নাটকই প্রযোজিত হয়েছে, শ্রদ্ধা-সহকারে দর্শক দেখেছে তাদের, কিন্তু সমাদর পেয়েছে মাত্র কতিপয়। "অচলায়তন" দেখতে গিয়ে নাটক প্রযোজনার এই সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। অথচ ঐ একই বিষয়বস্তু নিয়ে 'তাসের দেশ' অনেক আদরণীয় হয়। শিল্পের সুকুমার সৃষ্টিই এর কারণ হতে পারে। জওহরলাল নেহরু "গোল্ডেন বুক অব টেগোর"-এ লিখেছিলেন—···my deep homage to one, who has been···ever pointing to the finer and nobler aspects of life and never allowing as to fall into ruts which kill individuals as well as nations. —জীবনের এই মহত্তর এবং সুন্দরতর দিকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ "তাসের দেশ" নাটকটি করে থাকে। যদিও অনেক সময়ে এর পরিবেশনে নাগানের মান হয়ে থাকে সাধারণ, পরিকল্পনাও হয় অভিনবত্বহীন, তথাপি এ নাটকে নারীহৃদয়কে মেলে ধরা হচ্ছে, জড়তাকে ভাঙা হচ্ছে শুধু হাতুড়ি মেরে নয়, সংগীতের আবেদনে। "অচলায়তন" নাটকের মন্দগতি তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুসারী হয়ে দাঁড়ায়। দৃশ্য নাটকের সংলাপে যে কাটাকাটা ভাব থাকলে নাটকের উত্থান সম্ভব হয়, এতে কি তার অভাব আছে? সংলাপ যতটা পাঠযোগ্য, ততটা কি শ্রাব্য হতে পারে?

হয়তো কোনো নাট্যপ্রযোজক এবিষয়ে আলোক-পাত করতে পারেন।

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

(খ) ব্রহ্মরাজদরবারের কূটনৈতিক পত্রপ্রেরণের রীতি

ব্রহ্মরাজসরকারের চিঠি কিভাবে বিদেশীয় রাজা বা রাজপ্রতিনিধিদিগের নিকট দেওয়া হইত ইউল সাহেবের পুস্তকে তাহার বর্ণনা আছে। তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্‌ধৃত হইল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ আলং ফ্রা (Alaung Phaya) ইংলণ্ডের রাজার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন :

It was written on gold adorned with rubies. It was delivered to Mr. Dyer and others who visited him at Rangoon. It is not known what became of the letter. (Yul, p. 217)

মহারাজ মিন্‌ডনের রাজত্বকালে কর্নেল ইউল ও মেজর ফেয়ার আভা রাজন্‌সভায় ব্রিটিশ রাজসরকারেরও প্রতিনিধি স্বরূপে আগমন করেন। তাঁহারা ব্রহ্মের রাজার নামে যে-পত্র আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে ব্রহ্মরাজসরকার যে-পত্র দেন, তাহার সম্বন্ধে ইউল সাহেব লিখিয়াছেন :

২১শে অকটোবর,

আমাদিগের কতক লোক গতরাত্রিতে স্টীমারে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। অবশিষ্ট কয়েকজনের সহিত বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য ব্রহ্মের মন্ত্রিগণ প্রাতে রেসিডেন্সিতে আসিয়া আমাদের সহিত প্রাতর্ভোজন করিলেন।

নানাপ্রকার আলাপে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। মালোয়ে মিন্‌জী অন্য কক্ষে মেজর ফেয়ারের সহিত উচ্চ-ব্রহ্মের সীমান্তপ্রদেশের সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই বারোটার পর বিদায়গ্রহণ করিলেন। বলিয়া গেলেন যে ব্রহ্মরাজসরকারের চিঠি তাঁহারা শীঘ্রই পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু প্রায় সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও পত্র পৌঁছিল না দেখিয়া আমরা রেসিডেন্সি হইতে স্টীমারে যাইবার জন্য বহির্গত হইলাম। রেসিডেন্সিতে যে বর্মা-পল্টন ছিল, তাহারাও আমাদিগের সঙ্গে যাইবার জন্য বাহির হইল। কিন্তু রেসিডেন্সি হইতে যাত্রা করিয়া হ্রদের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই আমরা সংবাদ পাইলাম যে রাজসরকারের পত্র রেসিডেন্সিতে আসিতেছে। সুতরাং আমরা সেই স্থানেই থামিয়া চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, শোভাযাত্রার অগ্রে-অগ্রে অদ্ভুত (absurd) যোদ্ধবেশ-পরিহিত অশ্বারোহী সৈন্যগণ আসিতেছে। তাহাদিগের পশ্চাতে পদাতিক সৈন্য ও বর্মা ব্যানড। রাজদরবারের না-খান্‌-জী মহাশয় এক সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে আসিতেছিলেন। স্বর্ণমণ্ডিত এক হাওদার আটটি স্বর্ণছত্রের নিম্নে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই স্বর্ণনির্মিত ঢাল। ইংলণ্ডের মেলাতে বিয়োগান্ত নাটকের রাজার মতো তাঁহাকে স্বর্ণ ও জরির (tinsel) পোশাকে সজ্জিত করিয়া রাজার পত্রবাহকরূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

এইরূপ প্রথা দেখিয়া বোধ হইল যে ব্রহ্মসরকারের উচ্চ কর্মচারিগণ রাজার পত্রবাহকের কার্য করেন না।

আমরা পরামর্শ করিলাম যে সকলে একত্র নদীতীরে যাইয়া সেইস্থানেই রাজার পত্র গ্রহণ করিব। তদনুসারে ইরাবতীর তীরে যাইয়া বৃদ্ধ না-খান-জী অতিকষ্টে হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন। উন্‌-ডাউক না-খান-জীর হস্ত হইতে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ রাজদূতের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, ‘ইহা ইংলণ্ডের ভারতীয় শাসনকর্তার নিকট লিখিত ব্রহ্মরাজসরকারের পত্র।’

ব্রিটিশ রাজদূত পত্রখানিকে তাঁহার সেক্রেটারির হস্তে দিলেন। তিনি পত্রখানিকে একটি গিল্টিকরা সালভারের (salver) উপর স্থাপন করিয়া নৌকায় উঠিবামাত্র আমাদের স্টীমারের উপর ব্রিটিশ পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হইল।

স্টীমারে পৌঁছিবার পর দেখিলাম—পত্রের লেফাফাখানি এক আশ্চর্য জিনিস। খুব ভারী ও কঠিন পদার্থে নির্মিত দুইটি নলাকৃতি দ্রব্যকে গভীর লোহিতবর্ণের মখমলের থলিতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে জানিলাম, ওই নলগুলি হস্তিদন্তে নির্মিত। দৈর্ঘে প্রায় পনেরো ইনচি লম্বা। একটি নলে রাজার চিঠি এবং অন্য নলে হ্লুড'র চিঠি পুরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শীলগুলির কোনোটিতে শিখীমূর্তি এবং কোনোটিতে রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ছিল।

পত্র মুসাবিদা, লেখনপ্রণালী ও পাঠরচনা

রাজসরকারের চিঠি মুসাবিদা করিবার জন্য ভাষাবিদ্‌, বিদ্বান অমাত্যগণ নিয়োজিত হইতেন। লিপিকারগণ সুন্দর হস্তাক্ষরে তাহা লিখিয়া ওই মুসাবিদাগুলি হ্লুড'র মন্ত্রিগণের নিকট প্রেরণ করিতেন। তাঁহাদের অনুমোদনমতো হইলে, তালপত্রে এবং পুরু তুলোট কাগজে উৎকৃষ্ট লিপিকারগণের দ্বারা কালি বা সোনার জলে লিখিত হইত। প্রয়োজন অনুসারে তাহা নানাপ্রকার কারুকার্য করিয়া পদমর্যাদা অনুসারে মণিমুক্তা-দ্বারা খচিত হইত। ব্রহ্মরাজ্যের অভিনব স্বকীয় কারুবিদ্যা ও রাজশ্রী প্রকাশিত হইত।

চিঠি লিখিবার ভঙ্গি ও ভাষা অনেকাংশে ভারতীয় রাজকীয় পত্রাদির ন্যায় ছিল। নিম্নে একখানি পত্রের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে। পর সভ্যতাকে হীনশ্রেণী গণনায় অভ্যস্ত ইংরেজদিগের চক্ষে ইহা অতিশয় বিস্ময়জনক হইয়াছিল।

এই পত্রটি ব্রহ্মরাজ্যের অধীন আরাকান দেশের অন্তর্গত রামরীর রাজা কর্তৃক প্রেরিত, বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রের অনুবাদ। এই পত্র ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে বড়লাটের দপ্তরে গৃহীত হয়। মহারাজা বোডাফায়া তখন ব্রহ্মসাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। রামরীর রাজা তখন সম্রাট বোডাফায়ার অধীনে শাসনকর্তাভাবে নিযুক্ত ছিলেন। পত্রটি এই :

‘আমি রমাবতীর শাসনকর্তা নামিয়ো শূর, স্বর্ণ-

পদ্মপ্রতিম রাজপদে আমার মস্তক নত করিয়া, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাপ্রসিদ্ধ অধিপতি মহোচ্চগুণ-মণ্ডিত ভূপতি, সদ্ধর্মনামক শ্বেতহস্তীর অধীশ্বর, ধর্মনীতি-পালক, দশাঙ্গুশাসনানুষ্ঠানকারী, পূর্বতন ধর্মপালক মহীপতিগণের নির্দেশানুযায়ী সমস্ত সৎকর্মের অনুসরণকারী, দূরস্থ ও নিকটস্থ সমস্ত প্রাণিগণের পরিরক্ষণকর্তা, অজেয় সৈন্যবর্গ-সমন্বিত ইত্যাদি ইত্যাদি মহাসম্রাটের আদেশ শিরোধার্যপূর্বক এই পত্র দ্বারা বঙ্গদেশের গভরনর জেনরলকে জানাইতেছি যে—আমাদের শক্তিমান সম্রাট এই সুবৃহৎ ভূমণ্ডলের সর্বত্র সুপরিজ্ঞাত এবং অতুলনীয় ন্যায়ধর্মোপেত বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ রহেন। তাঁহার শত পুত্র, একসহস্র পৌত্র ও একটি প্রপৌত্র বর্তমান। এই প্রপৌত্রটিকে তিনি স্ব-অঙ্কে স্থাপন করিয়া লালনপালন করেন। তাঁহার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা অবচনীয়, তাঁহার প্রতি লোকের প্রীতি ও ভক্তি, দশটি সাধারণ হস্তী হইতে বৃহত্তর পূর্বোক্ত শ্বেতহস্তীর সুবৃহৎ আকারের সদৃশ সুউচ্চ ও সুবৃহৎ। এই রাজশিশু স্বর্গীয় দেবতাগণের আশীর্বাদস্বরূপ পরিগণিত। আমাদিগের সম্রাটের শক্তিমত্তা, প্রভাদৃষ্ট, ও অবর্ণনীয় যশোরাশি পৃথিবীর সর্বত্র পরিজ্ঞাত এবং সকল বিদেশীয় রাজন্যগণ তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকেন। যাঁহারা সম্রাটের সকাশে সম্মান ও পূজা প্রদানের জন্য আগমন করেন, তাঁহারা সর্বতোভাবে ধর্মনীতি ও রাজ্যপালননীতিতে শিক্ষিত হন। আমাদের প্রভু সকল জীবনের রক্ষাকর্তা।

কিওপুলন, লেনজেন, পায়াজী, এবং পূর্বদেশস্থ শিয়ান রাজ্যের নবতি নগর হইতে রাজা উডী (চীনদেশের উতিব্ওয়া) তাঁহার তিন কন্যাকে সম্রাটের স্বর্ণপদতলে উৎসর্গীকৃত করিয়া দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে সুখসৌভাগ্যযুক্ত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে অগণ্য শুভের সঞ্চার হইয়াছে।

যাহারা সুশাসননীতি সর্বতোভাবে পালন না করিয়া, অন্যায় ও অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয় তাহারা আমাদের মহাসম্রাটের অসন্তোষভাজন রহে। তিনি (ব্রহ্মের সম্রাট) তাঁহার সেনাপতিগণের নেতৃত্বে ঐসকল দেশ জয় করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন; সে দেশ তিনি অপহরণ করিয়া গ্রহণ করেন না, উহা জয় করিয়া ধর্মত যিনি সে দেশের সিংহাসনের অধিকারী তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করেন।

ব্রহ্মের সম্রাট ধর্মের অনুসরণ করেন, প্রাচীন ধর্মনীতি ও প্রথা পালন করেন, এবং অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্যের অনুমোদন করেন না।

রামু, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকা ইংরেজ-দিগের অর্জিত দেশ নহে। আরাকানের রাজধানী হইতে দূরে অবস্থিত হইলেও ওইসকল দেশ পূর্বে আরাকানের শাসনাধীনে ছিল এবং বর্তমানে উহা আমাদিগের সম্রাটের রাজ্য। ইংরেজ কোম্পানি বা ইংরেজজাতি প্রাচীন নীতি অনুবর্তন করে না। এইসকল প্রদেশ হইতে রাজস্বগ্রহণ করা তাহাদের উচিত হয় নাই। রাজস্ব গ্রহণ করিলেও ওই অর্থ ইচ্ছানুসারে ব্যয় বা আত্মসাৎ করা তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। কোম্পানির প্রতিভূ গভরনর জেনারল মহোদয়ের ঐ সকল প্রদেশ পরিত্যাগ করা উচিত এবং গৃহীত রাজস্ব সম্রাটকে অর্পণ করা বিধেয়।

যদি তিনি অস্বীকার করেন, আমি তাহা সম্রাটকে জানাইব। শৌর্যবান সৈন্যের সহিত সেনাপতিগণ জলপথ ও স্থলপথে প্রেরিত হইবেক। আমি নিজেও সমগ্র ইংরেজ-অধিকার গ্রহণ ও ধ্বংস করিবার জন্য যাত্রা করিব। ঐ সকল দেশ জয় করিয়া আমাদের সম্রাটের চরণে নিবেদন করিব। কিন্তু প্রথামত এই পত্রদ্বারা গভরনর জেনরলকে আমাদিগের দাবি অবগত করাইলাম।'

[ক্রমশ

চিরায়ত সাহিত্যের সন্ধানে

রণেন্দ্রনাথ দেব

কালিদাস ভারতের কবিকুলসূর্য। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বাঙলা সাহিত্যে কালিদাস সম্বন্ধে আলোচনা স্বল্প। উনিশ শতকে কালিদাস-প্রতিভার উপর আলোকপাত করেন বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ। এঁদের পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ক-টি অমূল্য প্রবন্ধ লেখেন "প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থে। এই আলোচনাগুলি মৌলিকতায় ভাস্কর। বিংশ শতকে কালিদাস সম্বন্ধে সেরকম উচ্চাঙ্গের বিশ্লেষণ চোখে পড়ে না। ব্যতিক্রম, অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি উজ্জ্বল প্রবন্ধ "রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য"। অন্য যেসব স্মরণীয় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তার মধ্যে শীর্ষে স্থান পাবার যোগ্য বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের "বাল্মীকি ও কালিদাস" রচনাটি। আরো দুয়েকটি গ্রন্থের নাম করা চলে: যেমন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত-প্রণীত "ত্রয়ী" ও প্রবোধচন্দ্র সেনের "ভারতাত্মা কালিদাস"। শেষোক্ত বইটিকে উপলক্ষ করে প্রখ্যাত দার্শনিক ও প্রশাসক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য একটি অসাধারণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন "কবি ও কবিতা" পত্রিকায়। তা সত্ত্বেও বলতে হয়—বাঙলার বিস্তৃত সমালোচনাভাণ্ডারে কালিদাসের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের উপকরণ কম। সম্প্রতি কালিদাসের রচনা-বলীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশে কিছু উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

কালিদাস রচনাসমগ্রের ভূমিকাপর্ব—শম্ভুনাথ চক্রবর্তী। নবার্ক। ডি সি ৯/৪ শাশ্বীবাগান, দেশবন্ধু নগর, কলকাতা-৭০০ ০৫৯। সেপটেম্বর ১৯৮৮। পৃ. ১৩৭। ছত্রিশ টাকা॥

মোলিয়ারের তিনটি নাটক—মূল-ফরাসি থেকে অনুবাদ—কল্যাণকুমার দত্ত। পুথিপত্র। ৯ অ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। অকটোবর ১৯৮৮। পৃ. ৬৮৮। পঞ্চাশ টাকা॥

কিন্তু রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের অনুবাদকে এখনো শ্রেষ্ঠ অনুবাদ বলা যেতে পারে। এই পরিবেশে শম্ভু-নাথ চক্রবর্তীর গ্রন্থটির প্রকাশকে স্বাগত জানাতে হয়। আমাদের ক্ষীণপ্রাণ কালিদাস-প্রশস্তিতে তাঁর গ্রন্থটি নবতম সংযোজন।

আলোচ্য বইটি অবশ্য পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ নয়। বইটিতে আছে বারোটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন ও যোগসূত্রহীন। কালিদাস-সাহিত্য-কেন্দ্রিকতাই তাদের একমাত্র যোগসূত্র। এদের নাম—কালিদাস রচনাসমগ্রের ভূমিকাপর্ব; কালিদাসের কাল, দেশ ও জাতিত্ব; এবং কুমারসম্ভব হইল; দেবরাজের স্বজনপোষণ: উৎকোচ-উর্বশী; চক্রবাকের প্রেম; রাজরাজত্ব: বাল্মীকির বনাম কালিদাস; কালিদাসের পিতৃহৃদয়; কালিদাসের পরমানায়িকা; মহাকবি কালিদাসের বিজ্ঞান-ভাবনা; সরযূ: গৌরবে ও অপমানে; সূর্যাস্তের আলোয় রামচন্দ্রের বংশধরেরা; দাশরথি রামের শেষ বংশধর। এ ছাড়া রয়েছে পরিশিষ্ট।

নামপ্রবন্ধটিতে কালিদাসের প্রতিভাকে সমগ্র-ভাবে অবলোকন করা হয়েছে। ত্রিশ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। "কালিদাসের পিতৃহৃদয়" এবং "কালিদাসের পরমা-নায়িকা" এ দুটি প্রবন্ধও তাৎপর্য-পূর্ণ। শেষ দুটি প্রবন্ধ "সূর্যাস্তের আলোয় রামচন্দ্রের বংশধরেরা" এবং "দাশরথি রামের বংশধর" অনেকটা একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি। তাহলেও প্রথম প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ। সূর্যবংশের অধঃপতনের চিত্র এঁকে কালি-দাস রাজন্যবৃন্দকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু কোনো-কোনো প্রবন্ধে আলোচকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণকে কষ্টকল্পিত মনে হল। "এবং কুমারসম্ভব হইল" এবং "দেবরাজের স্বজনপোষণ: উৎকোচ-উর্বশী"—এই প্রবন্ধ দুটি এ দোষে দুষ্ট। অধ্যাপক

নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সব মতই অভ্রান্ত নয়। কয়েকটি রচনা হালকা সুরে লেখা। এদের মধ্যে "চক্রবাকের প্রেম" ও "সরযূ : গৌরবে ও অপমানে" বিশিষ্টতা-পূর্ণ।

আলোচকের কাছে ভবিষ্যতে বিস্তৃততর বিশ্লেষণ এবং গভীরতর সন্ধানবৃত্তি প্রত্যাশা করি।

মোলিয়্যার ফরাসি নাট্যজগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তাঁর জন্ম ১৬২২ সালে, মৃত্যু ১৬৭৩ সালে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের জীবনে মোলিয়্যার ফরাসি নাট্যজগৎকে শ্রেষ্ঠতার সম্মান দান করেন। এই পঞ্চাশ বছরের জীবনের অধিকাংশই ব্যাপৃত ছিল সংগ্রামে। তাঁর স্ত্রীর কাছে তিনি উপযুক্ত ব্যবহার পান নি। তাঁর শত্রুরা তাঁকে মৃত্যুতেও নিষ্কৃতি দেয় নি। তাঁর পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন হয়েছিল বহু কষ্টে। জীবন যাঁর উদ্বেগে আর সংগ্রামে জর্জর, তাঁর শিল্পকলায় শুধু অবিমিশ্র আনন্দের প্লাবন।

মোলিয়্যার তাঁর নাটকাবলী মুদ্রণে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নাট্যরসপরিবেশন। এ বিষয়ে শেকসপীয়রের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু আজ মোলিয়্যার স্মরণীয় শুধু অসাধারণ নাট্যগুণের জন্য নয়, শিল্পকলার অপরূপ বৈভবের জন্যও বটে। মাত্র আঠারো বছরের মধ্যে তিনি যে আটাশটি নাটক সৃষ্টি করেন, তাদের প্রত্যেকটি অনিন্দ্য কলাসৌষ্ঠবে পূর্ণ। সমালোচকেরা মোলিয়্যারের হাস্যরসের মধ্যেও এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন। মোলিয়্যার কমেডির কোনো নতুন প্রজাতির সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনন্য। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে দ্বৈতসত্তা—তিনি একই সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন সত্য ও মিথ্যা, সুশ্রী ও কুশ্রী, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিককে। ফরাসিভাষী ব্যক্তিরা মোলিয়্যারকে যে একান্ত আপনার জন বলে ভাবেন, তা কিছু অন্যায় নয়।

বাঙলা ভাষায় ফরাসি নাটকের অনুবাদ নতুন নয়; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর পথপ্রদর্শক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া আরো ছয়েকজন অনুবাদক মূল ফরাসি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন নাটকের। অধ্যাপক কল্যাণকুমার দত্ত মূল ফরাসি অবলম্বনে মোলিয়্যারের তিনটি নাটককে বাঙলায় উপস্থাপন করেছেন—ল্য বুর্জোয়া জঁাতীয়ম্ (জাতে ওঠার পাঁচালি), জর্জ দাঁ দ্যাঁ উ ল্য মারি কঁ-ফছ্য (স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্) ও ল্যা' ভার (অর্থপরায়ণ)।

আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর সাংস্কৃতিক জগতে যে-কটি ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম সঞ্চারিত হয়েছে, তার একটি হল বিদেশী ভাষা আর সাহিত্য বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি। আজকাল প্রচুর তরুণকে ফরাসি জার্মান রাশিয়ান তো বটেই, এমনকী স্প্যানিশ ও ইতালিয়ান সাহিত্যও পাঠ করতে দেখা যায়। গ্রীক আর ল্যাটিন ভাষাতেও কেউ-কেউ দক্ষতা অর্জন করেছেন। এ-সবই সুখের কারণ। বাঙলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি ফরাসি সাহিত্যের চর্চার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। অধ্যাপক কল্যাণকুমার দত্ত মূল ফরাসি থেকে অনুবাদের কাজে হাত দিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তিনি গ্রন্থটির ভূমিকায় মোলিয়্যারের জীবনকথা ও তাঁর রচিত নাটকের তালিকা সন্নিবেশিত করেছেন। টীকাটিপ্পনী অংশটি বিস্তৃত না হলেও দামি। সব জড়িয়ে অনুবাদকার্যটি পরিশ্রমে সম্পন্ন। আমি ফরাসি ভাষায় অভিজ্ঞ নই। অধ্যাপক দত্তের অনুবাদ মূলানুগ হয়েছে বলেই মনে হয়।

কিন্তু অনুবাদটির বড়ো ত্রুটি ভাষায় প্রসাদগুণের অভাব। মোলিয়্যারের অপরূপ দ্যুতিময় ভাষা অনুবাদে ঠিক ফুটে ওঠে নি। এমনকী গানগুলিও গীতিধর্মের স্নিগ্ধতাবিহীন, যেমন

মদনরাজ্যে একটি হৃদয়
হাজার চিন্তায় সদাচঞ্চল;
লোকে বলে বটে সুখেই আমরা
ফেলি দীর্ঘশ্বাস, হই হীনবল;

যে যা-ই বলুক,
স্বাধীনতা হেন কিছু নাই মিঠে নিরমল।

মোলিয়্যার যে আসলে একজন বড়ো নাট্যকার এবং তাঁর নাটক যে অসামান্য প্রাণবন্ত, অনুবাদক তা জানেন। পরিশিষ্ট অংশে তিনি নিজেই দেখিয়েছেন "হঠাৎ নবাব"-এর বিভিন্ন সংস্করণে পরিমার্জনের দ্বারা মোলিয়্যারের নাটককে বাঙলায় কতটা জীবন্ত করে তোলা যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে চেষ্টা করেছেন। তবু অনুবাদকের চেষ্টা নিষ্ফল হয় নি। ফরাসিভাষা-শিক্ষার্থী বাঙালি ছাত্রেরা এ বইটি পাঠ করে প্রভূত উপকৃত হবেন।

দুটি বইয়েরই প্রচ্ছদ আর মুদ্রণ সুন্দর।

কৌতুকীকণা সংকলন

আলোচ্য গ্রন্থটি অজস্র কৌতুক-কাহিনীর সংকলন। ইংরিজিতে এরকম সংকলনগ্রন্থ অনেক রয়েছে। বাঙলায় ওরকম বই কম। সে হিসেবে বইটিকে স্বাগত জানাতে হয়। বিষয়গুলিকে ভাগ করা হয়েছে এভাবে—ডাক্তার-রোগী, রেস্তোরাঁ, বিস্মৃতি-ভুলবোঝা, অতিরঞ্জন-গুলতাপ্পি, পাগলপালা, মাতালমঙ্গল, আইন-আদালত, কিশোর-স্পেশাল, অ্যাডাল্ট স্পেশাল, কৌতুকীর আলোয় কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান।

উদাহরণ হিসেবে দুটি গল্প উদ্ধৃত করছি :

এক। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ এক বিদেশী সাংবাদিককে মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন : নোবেল প্রাইজ পাবার পর সেই সাহেব ব্যঙ্গভরে কবিগুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'গীতাঞ্জলি বইটা দারুণ হয়েছে। কিন্তু টেগোর, কে আসলে লিখে দিয়েছে তোমার হয়ে?'

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'তার আগে বলো দিকি, তোমার হয়ে কে পড়ে দিল গীতাঞ্জলির মতো বই?'

দুই। মফস্বলের বিরাট সাহিত্যসভায় কলকাতা থেকে একজন মহান ঔপন্যাসিককে প্রধান বক্তা হিসাবে জামাই-আদরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি একটা ভীষণ নামকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত, এবং যেমন মোটা রোজগার করেন তেমনি চরম তাঁর পানাসক্তি।

নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা দেড়েক পরে তাঁকে টলায়মান অবস্থায় ঠেলেঠুলে স্টেজে তোলা হল। উনি মাইকটা চেপে ধরে বলতে লাগলেন—'বঙ্কিমচন্দ্র মারাত্মক কল্পনাপ্রবণ, আর তারাশঙ্কর ভয়ঙ্কর—কী বলে, বাস্তববাদী। বঙ্কিমশঙ্কর পুরুষকে দেখেছেন বীরযোদ্ধারূপে, নারীকে সুন্দর ভোগ্যরূপে। (হেঁচকি) তারাচন্দ্র মেহনতি লোকদের লড়াইয়ের ছবি এঁকেছেন। হ্যাঁ, তাঁদের নেশার কথাও (হেঁচকি) বলেছেন। ব্যোমশঙ্কর-এর উপন্যাসে মিষ্টিগান আছে অনেক। তারাচাঁদের গানের ভাষা খটোমটো! শঙ্করচাঁদ ভাগ্যবাদী, আর ট্যারাবন্ধু অ্যাডভেঞ্চারাস…'

এর পরই হৈ-হৈ করে সভার লোক উঠে দাঁড়াল এবং মঞ্চে ঢিলপাটকেল পড়তে লাগল!

বাঙলার সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে অনেক চুটকি গল্প প্রচলিত। সম্পাদকদ্বয় এরকম একটি সংকলন বার করতে পারেন কি?

মজারু মজলিশ-কথা। সম্পাদনা ও উপস্থাপনা—ড. অরুণোদয় ভট্টাচার্য ও দিগম্বর দাশগুপ্ত। চিত্রশিল্পী চণ্ডী লাহিড়ী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩। নভেম্বর ১৯৮৮। পৃষ্ঠা ২১০। পঁয়ত্রিশ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ এবং যামিনী রায় প্রসঙ্গ

বিষ্ণু দের দুটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রতিভাস ধন্যবাদার্হ। "রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতামালা। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। "যামিনী রায়" বইটি প্রথম বেরোয় ১৯৭৭-এ।

বিষ্ণু দের রচনারীতি জটিল, কখনো-কখনো দুর্বোধ্য। চিন্তাপ্রণালীকেও স্বচ্ছ বলা চলে না। কিন্তু তাঁর রচনাকে উপেক্ষা করা কঠিন। সবকথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা না গেলেও তাঁর চিন্তাধারাকে অনুসরণ করা একান্ত অসম্ভব নয়। আধুনিকতার সংজ্ঞা কী হতে পারে, তাই নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত প্রথম বইটিতে। মার্টিন লুথারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করে বিষ্ণু দে দেখাতে চেয়েছেন ব্যক্তিমন সমাজসংলগ্নতা পেয়ে ব্যাখ্যাগম্য হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতার ব্যাখ্যায় অনেক সময় অনাবশ্যক পাণ্ডিত্যের বোঝা চাপানো হয়। উদাহরণস্বরূপ "শিশুতীর্থ" কবিতার একটি ভাষ্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। বিষ্ণু দের মতে 'রবীন্দ্রনাথের সত্তা-সংকটের তীব্রতা ও ব্যাপ্তিবৈচিত্র্য বোধহয় বিশ্বে তুলনারহিত।' রবীন্দ্রনাথের মনোজীবন বিশ্লেষণ করে লেখকের ধারণা হয়েছে 'সংকট বা ক্রাইসিসবোধ, এই দ্বন্দ্বময় ক্রমিকতাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিস্বরূপের সবচেয়ে বড় কথা। তাঁর dark period মাঝে-মাঝে যে আসত, খ্যাতির শিখরেও যে তাঁকে আত্মগ্লানি ঠেলা দিত আত্মহত্যার মতো মনোভাবে, সে কথা তো রবীন্দ্রালোচকদের জানা উচিত।' বইটির শেষ পর্যায়ে বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথ ও ব্রেখটের তুলনাত্মক আলোচনা করেছেন।

বইটির কোনো-কোনো অংশে নতুন আলোর সন্ধান পাওয়া যায়। আধুনিক ইয়োরোপীয় কাব্য-আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ কি সত্যি আকৃষ্ট হন? এলিয়ট পাউনড রবিনসনের যে কবিতাগুলির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধমধ্যে দিয়েছেন সেগুলি সযত্নকৃত নয়। কোথাও-কোথাও মূল বিষয় থেকে সরে গেছে। বিষ্ণু দে নিজে নতুন করে এই কবিতাগুলির অনুবাদ পেশ করেছেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সবগুলি বিশেষত্ব রবীন্দ্রনাথ বুঝবার চেষ্টা হয়তো করেন নি।

বিষ্ণু দের আলোচনার গুরুত্ব লাঘব না করেও বলা যায় তাঁর লেখার কিছু-কিছু তাৎপর্য সুবোধ্য নয়।

"উৎসর্গে"র তেইশ-সংখ্যক যে কবিতাটি তিনি উদ্‌ধৃত করেছেন (পৃ ৬৪-৬৬) এর চেয়ে ভালো আর-কোনো দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যেত না রবীন্দ্রকাব্যে? "কবিকাহিনী" থেকে দীর্ঘ উদ্‌ধৃতিটিও (পৃ ৪০) নিষ্প্রয়োজন।

বিষ্ণু দে-র অন্যান্য লেখার মতো এ বইতেও পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে মারিতঁ্যা, মাতিসে, পিকাসো, ব্রাক, বার্টক, প্রোকফিয়েফের ঘন-ঘন উল্লেখ। এ বইয়ে এসব মুদ্রাদোষ পরিহার করলেই ভালো হত।

বইটির শেষাংশে ব্রেখটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনাও অপ্রাসঙ্গিক বলা চলে। 'মার্কসীয় দর্শন সাহায্য করে মানুষের সম্বন্ধসমূহ বুঝতে, মানুষের আচার ব্যবহার চোখ খুলে দেখতে, মানুষের শক্তির নির্দিষ্টতা ও তার অপরিসীম সম্ভাবনাময়তার স্বরূপ চিনতে জানতে'—হয়তো বিষ্ণু দের একথা গ্রহণীয়। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গে "ডায়ালেকটিকল থিয়েটর"-এর প্রসঙ্গ টেনে আনা জবরদস্তিমূলক। ডায়ালেটিকসের সন্ধান বিষ্ণু দের আলোচনাটিকে গভীরতা দান করে নি।

রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা—বিষ্ণু দে। প্রতিভাস, কলকাতা-২। সেপটেমবর ১৯৮৭। পৃ ১০৯। পনেরো টাকা।

যামিনী রায়—বিষ্ণু দে। প্রতিভাস, কলকাতা-২। অগস্ট ১৯৮৭। পৃ ১৬৬। ত্রিশ টাকা।

"যামিনী রায়" বইটি তুলনামূলকভাবে সহজবোধ্য এবং সুপাচ্য। অবশ্য এ বইয়ের ডায়ালেকটিকসের উৎপাত আছে এবং মহারথীদের নামোল্লেখ রয়েছে। তবু সব জড়িয়ে বইটি পড়া সুখকর। বোধহয় এটিই একমাত্র বই যা বিষ্ণু দে সহজ ভঙ্গিতে লিখেছিলেন।

যামিনীবাবুকে বিষ্ণু দে চিনতেন দীর্ঘদিন ধরে। যামিনী রায়ের চিত্রকলার বিবর্তন এবং মানুষ যামিনী রায়ের একটি অন্তরঙ্গ বর্ণনা দিয়েছেন বিষ্ণু দে। দুয়েকটি কথা খুব গেঁথে যায় মনে।

১. যামিনী রায় গ্রামের জীবন থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছেন কিন্তু গ্রামের জীবনযাত্রায় তিনি ক্লান্তিবোধ করতেন। তাঁর প্রকৃত অধিষ্ঠানভূমি ছিল কলকাতায়। তাঁর বড়ো ছেলে বাঁকুড়ার জঙ্গলে রহস্যময়ভাবে নিহত হন। বিষ্ণু দে-কে তিনি জঙ্গলে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

২. যামিনী রায় মানুষকে চিনে নিতে পারতেন সহজে। '১৯৪৭ সাল নাগাদ তাঁর কাছে আমাদের প্রদেশের বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। যামিনীদা তাঁরই ভাষায় 'পোট্রেট'-এ বা চেহারায় শিল্পীর চোখের অভিজ্ঞতায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। চিন্তিত হলেন উক্ত রাজ্যের মঙ্গলের বিষয়ে। এবং যখন সেই বিমূঢ় ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, শিল্পী আরো বিচলিত হলেন, এবং বললেন: না মশায়, আপনাকে দিয়ে তো হবে না। আপনি রাজ্য চালাতে পারবেন না। কিন্তু শুধু খুদে মানুষের আকার এবং মুখচোখভঙ্গি দর্শকের মনে ছাপ রেখে যায় না, আসলে মানুষের গোটা ব্যক্তিত্বই জাতশিল্পীর চোখে প্রত্যক্ষ।' (পৃ ১৪)

৩. সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা হীরেন মুখার্জিকে যামিনী রায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কি ভেবেছেন—কি রকম পুলিশ আমাদের হবে? তাদের পোশাক ও পাগড়ি বা টুপি কি রকম হবে?'

হীরেনবাবু: আমার মনে হচ্ছে আমরা বোধহয় ওই একটা ডিটেল্-এর ব্যাপারে এখন পর্যন্ত ভাবি নি।

যামিনী রায়: ওটা একটা ছোট ডিটেল্? আপনারা বিশ্বাস করেন যে আপনারা একটা ভাবী পরিকল্পিত সমাজ ভাবতে পারেন নিজের মনে ছবিটা না ভেবে অন্তত খানিকটা, গভরনমেনটের যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার...পুলিশের সাজপোশাক কি হবে। এরকমভাবে চললে আপনাদের শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন একেবারে ঘোঁট পাকিয়ে যাবে।" (পৃ ১৩-১৪)

এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া চলে।

যামিনী রায়ের জীবনকথা সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলেছেন লেখক। তবে দুয়েকবার পুনরাবৃত্তি হয়ে গেছে (বইটি যেহেতু আলাদা-আলাদা প্রবন্ধের সংকলন)। যামিনী রায়ের কথালাপগুলির অনুলিখন প্রশংসনীয়।

একটি প্রবন্ধ বাদ দিলে ভালো হত—সেটি হচ্ছে "যামিনী রায় ও শিল্পবিচার"। শ্রীঅশোক মিত্রের একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদে এটি লেখা হয়। কিন্তু মূল প্রবন্ধটি হাতের কাছে না থাকায় বিষ্ণু দের উষ্মার কারণ স্পষ্ট বোধগম্য হয় না। বরং শ্রীমিত্রের প্রবন্ধের যে কটি উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন বিষ্ণুবাবু, সেগুলি পড়ে কোনো-কোনো বিষয়ে শ্রীমিত্রের মতকেই সমর্থনযোগ্য মনে হল।

যেসব ছবি আর স্কেচের নিদর্শন দেওয়া হয়েছে সেগুলো এ বইয়ের মান-অনুরূপ হয় নি। যামিনী রায় সম্বন্ধে বিষ্ণু দের আলোচনা মূল্যবান আলোচনা, এবং এ লেখার সহযোগী চিত্রপ্রতিলিপিগুলিও উন্নত মানের হওয়া কর্তব্য।

গ্রন্থে যামিনী রায়ের অনেকগুলি চিঠি সংকলিত হয়েছে। চিঠিগুলির মূল্য অসামান্য। এরকম আরো চিঠি প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশের প্রখ্যাত শিল্পী-গায়কদের চিঠি সংগৃহীত হয় না কেন? মফসসলের একটি পত্রিকার ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মাকে লেখা ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কটা চিঠি পড়েছিলাম। অসাধারণ কৌতূহলজনক

সেসব চিঠি। এদের মূল্য সম্বন্ধে আমরা অনবহিত কেন?

বিষ্ণু দের আলোচনা কখনো স্তিমিত নিষ্প্রাণ নয়, দুটো বই পড়ে আবার তা উপলব্ধি করলাম।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যে একটি অবশ্য-উচ্চার্য নাম। তাঁর উপন্যাস, গল্প, নাটক ও অন্যান্য গদ্যরচনার চর্চা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য। আমরা সবসময়ে এই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকি না। তার প্রথম কারণ, ওয়ালীউল্লাহ-রচনার অপ্রতুলতা। দ্বিতীয় এবং গুরুতর কারণ: তাঁর সম্পর্কে আমাদের উপেক্ষা, অবহেলা, অর্ধমনস্কতা। এই অবহেলা এই বঙ্গে কতদূর যেতে পারে, তার পরিচয় পেলে স্তম্ভিত হতে হয়। অথচ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭০) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে এম. এ. শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন (১৯৪৫), ওই বছরেই "স্টেটসম্যান" পত্রিকার সহ-সম্পাদকপদে যোগ দেন। দেশবিভাগের পরে চলে যান ঢাকায়। পাকিস্তান সরকারের বিদেশ-বিভাগে কাজ নিয়ে ঘোরেন দেশবিদেশে, পারীতে ইউনেস্কোতে কাজ করেন (১৯৬৭-১৯৭০), পারীতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর পাশে ছিলেন ফরাসি সহধর্মিণী মার্সেল তিবো। তাঁর প্রথম গল্প-গ্রন্থ "নয়নচারা" (১৯৪৫) প্রকাশিত হয় কলকাতার পূর্বাশা প্রকাশন থেকে। তাঁর প্রথম উপন্যাস "লালসালু" প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। এর ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয় পারী থেকে (১৯৬১)। ওই বছরই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসেবে ঢাকার "বাংলা একাডেমি পুরস্কার" লাভ করেন। দ্বিতীয় উপন্যাস "চাঁদের অমাবস্যা" (১৯৬৪) আর তৃতীয় উপন্যাস "কাঁদো নদী কাঁদো" (১৯৬৮) প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। ১৯৬৭ সালে "লালসালু"র ইংরেজি রূপান্তর প্রকাশিত হয় লনডনের প্রকাশন-সংস্থা শ্যাটো অ্যানড উইনডাস থেকে ইউনেস্কোর সহযোগিতায়। তাঁর দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ "দুই তীর ও অন্যান্য গল্প" (১৯৬৫) প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। "গল্পসমগ্র" (১৯৭২) প্রকাশিত হয় কলকাতার শুকসারী প্রকাশন থেকে। এ ছাড়া তিনটি নাটক—"বহ্নিশীর" (১৯৬০), "তরঙ্গভঙ্গ" (১৯৬৪), "সুড়ঙ্গ" (১৯৬৪) প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। এ ছাড়াও লিখেছেন একাঙ্কিকা, প্রবন্ধ, সমালোচনা-নিবন্ধ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মুদ্রিত সব রচনা (গ্রন্থিত আর অগ্রন্থিত) নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী, দু খণ্ডে (চার শ পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ড—সমগ্র উপন্যাস, মাঘ ১৩৯২, জানুয়ারি ১৯৮৬; ছ-শ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় খণ্ড—উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাঙলা রচনা, মাঘ ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭)। প্রকাশ করেছেন ঢাকার বাংলা একাডেমি, সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ আকরম হোসেন।

এমন সুসম্পাদিত রচনাবলী বহুদিন চোখে পড়ে নি। লেখকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সম্পাদনাকর্মে নিষ্ঠা এই রচনাবলীতে দেখা যায়। সে সম্পর্কে পরে লিখি। তার পূর্বে ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে এই বঙ্গের পাঠকসমাজকে অবহিত করা কর্তব্য বলে মনে করি। সেক্ষেত্রেও সম্পাদক আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের শেষে মুদ্রিত লেখক-প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়ালীউল্লাহর জীবনের প্রথম পর্ব: ১৯২২-১৯৪৩। এই কালপরিধিতে তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত ও প্রতিপালিত। মাতৃ ও পিতৃ—উভয় দিক থেকে সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়ায় ওয়ালীউল্লাহর স্কুল ও কলেজ-জীবন কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ী হয় নি। মানিকগঞ্জ, মুন্‌শিগঞ্জ, ফেনি, চুঁচুড়া, সাতক্ষীরা, কুড়িগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গায় ঘুরেছেন। ব্রিটিশ ভারতে কোনো মহকুমা-শাসক বা জেলা শাসকের ছেলের পক্ষে অবাধে জন-সাধারণের সঙ্গে মেশার সুযোগ ছিল না। অল্প বয়সে ওয়ালীউল্লাহর মায়ের মৃত্যুতে তাঁর পিতা দ্বিতীয়দার পরিগ্রহ করেন, যার অব্যবহিত ও সূক্ষ্মতর প্রতিক্রিয়া ওয়ালীউল্লাহর শিশুচিত্তে পড়া খুবই সঙ্গত। এ দুই কারণে ওয়ালীউল্লাহ হয়ে উঠেছিলেন অন্তরমুখী। লেখক স্বয়ং নিজেকে বিভিন্ন সময় ত্রিশঙ্কু, নিঃসঙ্গ ও বিবিক্ত স্বভাবের বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ জনদের স্মৃতিচারণেও তাঁর এই ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় স্পষ্ট আভাসিত।

অথচ কর্মজীবনে ওয়ালীউল্লাহকে প্রায়শই বহু ঘটনা ও মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা ও করাচি কেন্দ্রে বার্তা-সম্পাদক-রূপে এবং দিল্লি, সিডনি, পারী, জাকার্তায় পাকিস্তান বিদেশ বিভাগের প্রেস-অ্যাটাশে রূপে ও পারীতে ইউনেস্কোর প্রোগ্রাম-স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজের সময়ে তাঁকে নানা ধরনের ঘটনার সংস্পর্শে আসতে হয়। বস্তুত এই ধরনের কাজের সময় তিনি ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে মেলামেশা অপেক্ষা ঈষৎ দূর থেকে ঘটনার তাৎপর্যসন্ধান ও ব্যাখ্যায় নিরত ছিলেন। তার ফলে অন্তরমুখী চরিত্র বহিরমুখী হয়ে উঠতে পারে নি।

ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তরুণ ওয়ালীউল্লাহ ছাত্র-জীবনে ছিলেন সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর এবং স্থূল ধর্মবোধে আস্থাহীন ও শ্রদ্ধাশূন্য। ছাত্র ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন অতিমাত্রায় গ্রন্থময় ও কল্পনাপ্রিয়। অথচ তাঁর সহপাঠী ও সহ-আবাসিকদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে পূর্ববাঙলার রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গণ্য হয়ে উঠেছিলেন। ওয়ালীউল্লাহর সে ধরনের কোনো ইচ্ছেই ছিল না। কাজি আফসারউদ্দীন আহমেদকে লেখা চিঠিতে তার প্রমাণ পাই—'আপনার ও আমার মাঝে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটলেও আমরা পরস্পর নিঃসঙ্গই থাকবো। মানুষের নিঃসঙ্গতাই আসল ও খাঁটি রূপ, হয়তো।'

ওয়ালীউল্লাহ ১৯৪১-৪৩ সালে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে বি. এ. পড়তেন। এই সময়ে তাঁর জীবনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। গল্প ও কবিতা-রচনায় মনোযোগী হন। "মাসিক সওগাত"-এর সম্পাদক-উপন্যাসলেখক কাজি আফসারউদ্দিনের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে আসেন। ওয়ালীউল্লাহর লেখক-ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক পরিচয় এই সময়ে পাওয়া যায়। কাজি আফসারউদ্দিন আহমেদকে আর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন:

'সাহিত্যিক হতে হবে বলে লেখা—সে আমি ঘৃণা করি। প্রাণের উৎস থেকে না বেরুলে সে আবার লেখা। আপনা থেকে যা বেরুবে তা-ই খাঁটি—লেখকের পক্ষ থেকে বিচার করলে (পাঠকের কাছে বিচার পরে), তার জন্য শেষোক্ত লেখকের মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

এসময়ে ওয়ালীউল্লাহ মুসলিম-জীবনাশ্রিত সাহিত্য-রচনার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, মুসলমান লেখক মুসলমানদের জন্যই লিখবে (দ্র. সৈয়দ আবুল মকসুদের "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য", ১৯৮১)। সুখের বিষয়, এই গোঁড়ামি তিনি পরে পরিত্যাগ করেন, হয়ে ওঠেন সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাসলেখক।

তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৩-১৯৪৭) কালান্তরের পর্ব। মফসসল শহরে তাঁর সাহিত্যচর্চা ছিল অন্তর্লীন, নিঃশব্দচারী। কলকাতা শহরে এম. এ. ক্লাসের ছাত্রজীবন ও স্টেটসম্যান পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কর্ম উপলক্ষে তাঁর সাহিত্যচর্চা হয়ে ওঠে সতেজ, আবর্তময়, ঊর্ধ্বমুখী। অচিরেই সওগাত, মোহাম্মদী, পূর্বাশা, অরণি, চতুরঙ্গ, পরিচয়, বুলবুল

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচনাবলী—খণ্ড ১: জানুয়ারি ১৯৮৬; খণ্ড ২: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। একশ টাকা, একশ পঞ্চাশ টাকা। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

প্রভৃতি পত্রিকায় ক্রমাগত ওয়ালীউল্লাহর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। মাতুল খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলামের সান্নিধ্য, সমর্থন ও সাহায্য এ পর্বে তাঁর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠায় বিশেষ সাহায্য করে।

তৃতীয় পর্বে (১৯৪৭-৫০) ওয়ালীউল্লাহ পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসী। রেডিও ঢাকার সহকারী-বার্তা-সম্পাদক ওয়ালীউল্লাহর এ সময়ে লেখা ছোটো-গল্পে দেশবিভাগজনিত বিপর্যয়ের ছবি ধরা পড়ে। স্বভাবসুলভ অন্তর্মুখিতা ও মৌন স্বভাবের কারণে এ-সময়ে তিনি আত্মনিযুক্ত হয়েছেন নবতর সৃষ্টিকর্মে, যার ঐশ্বর্যবান ফল তাঁর প্রথম উপন্যাস "লালসালু" (১৯৪৮)। এখানেই আমরা পাই আধুনিক উপন্যাস -লেখক ওয়ালীউল্লাহকে।

জীবনের চতুর্থপর্বে (১৯৫৭-১৯৭১) দেশে-বিদেশে বিবিধ গুরুদায়িত্ব পালনের কৃতিত্বে, সৃষ্টির বৈচিত্র্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সৃষ্টিশীল লেখক-ব্যক্তিত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই বিশ বছরের প্রায় পুরো সময়টায় তিনি ছিলেন বিদেশে কর্মসূত্রে, যার মধ্যে প্যারীতেই ছিলেন সাড়ে দশ বছর।

প্যারীতে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে শিল্প-সাহিত্যের সমকালীন আন্দোলন সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ বিস্তৃতভাবে পরিচিত ও যুক্ত হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন, একথা নির্ভুলভাবে ইঙ্গিত করেছেন সম্পাদক। ইমপ্রেশনিজম - সুররিয়ালিজম - একজিসটেনশিয়ালিজমের সংঘাতে আলোড়িত ছিল তখনকার (১৯৬১-১৯৭১) ফ্রান্স তথা পশ্চিম ইওরোপ। কামু-কাফকা-সার্তর-বেকেট-এর সৃষ্টিবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ইওরোপ এই তীক্ষ্ণধী, অন্তর্মগ্ন, মানস-নিঃসঙ্গ শিল্পী ওয়ালীউল্লাহকে প্রভাবিত করেছিল। এসময়েই তিনি লেখেন "চাঁদের অমাবস্যা" (১৯৬৪) আর "কাঁদো নদী কাঁদো" উপন্যাস। এ-দুটিতে সমকালীন ফরাসি-দর্শনের আর কামু - সার্তর - এর অস্তিত্ববাদের প্রভাব লক্ষণীয়। সম্পাদক তার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

বস্তুত আর কোনো বাঙলা উপন্যাসলেখক সম্পর্কে একথা বলা যায় না। সৈয়দ মুজতবা আলি, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও লোকনাথ ভট্টাচার্যের কোনো-কোনো উপন্যাসে অস্তিত্ববাদ তথা কামু-সার্তর-এর দর্শনের প্রভাব পড়েছে, কিন্তু সেই দর্শনের সামগ্রিক বক্তব্য আত্মস্থ করে উপন্যাস লিখেছেন ওয়ালীউল্লাহ, একথা অবশ্যস্বীকার্য। সম্পাদক দেখিয়েছেন, সার্তর-এর তত্ত্ব "চাঁদের অমাবস্যা" উপন্যাসে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে :

'ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে ব্যক্তিমাত্রই স্বাধীন, স্বয়ং-শাসিত এবং সে নিজেই তার নিয়ন্ত্রক ও নির্মাতা ; কোনো অনির্দেশ্য সার্বভৌম শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে না—সার্ত্রের এ-তত্ত্বের মতো ওয়ালীউল্লাহর "চাঁদের অমাবস্যা"র আরেফ আলীও রাষ্ট্র-সমাজনীতি-ধর্ম, স্বার্থ-সংস্কার, আচার-অভ্যাসের বশবর্তী প্রাত্যহিক বিমিশ্র সত্তা থেকে সম্ভাবনাপূর্ণ স্বাধীন চৈতন্যময় শুদ্ধসত্তায় উত্তীর্ণ হতে চায়।' (রচনাবলী ১, পৃ ৩৮৯)

"চাঁদের অমাবস্যা" সম্পর্কে আরো একটি বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য।

'হাঙ্গেরীর গোর্কি' নামে পরিচিত টিবোর ডেরি "নিকি" নামে একটি উপন্যাস লেখেন (১৯৫৫)। এটিতে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন, ব্যক্তিমনে সার্বিক আতঙ্ক আর তা থেকে মুক্তিলাভের ভীরু বাসনা রূপায়িত। অনেকে মনে করেন, হাঙ্গেরীর গণ-অভ্যুত্থানের (১৯৫৬) মূলে এই বইটির প্রভাব ক্রিয়াশীল। এটির ইংরেজি অনুবাদ (১৯৫৮) বা ফরাসি অনুবাদ ওয়ালীউল্লাহ নিশ্চিত পড়েছিলেন। পাইন-ফার-এলম-বেষ্টিত ফ্রান্সে আল্পস পর্বতাঞ্চলের ইউরিয়াজ গ্রামে বসে "চাঁদের অমাবস্যা" উপন্যাসের নায়ক যুবক-শিক্ষকের আতঙ্কগ্রস্ত মনের ছবি আঁকার সময় লেখকের মনে কেবল গ্রাম-বাঙলার উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাতের দৃশ্যই ভেসে ওঠেনি, সেইসঙ্গে সামরিক শাসন-নিপীড়িত দুর্ভাগা বাংলাদেশের কথাও মনে পড়েছিল টিবোর ডেরির উপন্যাসের রাজনৈতিক পটভূমি প্রসঙ্গে, তাতে সন্দেহ নেই।' (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি', ১৯৮৭, কলকাতা)

তিনটি সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস বাঙলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন ওয়ালীউল্লাহ। কেবল একারণেই তিনি স্মরণযোগ্য। তাঁর লেখা ছোটোগল্পেও এই আধুনিকতার নির্ভুল উপস্থিতি অনায়াসলক্ষণীয়। রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে বিধৃত গল্পসমূহ তার পরিচায়ক। সম্পাদক অশেষ যত্নের সঙ্গে সব সংকলিত ও অ-সংকলিত গল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন তাঁর অন্যান্য রচনার (নাটক, একাঙ্কিকা, প্রবন্ধ ও সমালোচনা-নিবন্ধের)। এইসব অগ্রন্থিত রচনার সমাহরণ ও সংকলনে তাঁর নৈপুণ্য প্রমাণিত। সম্পাদকের দৃষ্টি যে ব্যাপক ও গভীরবিস্তারী, তার প্রমাণ ওয়ালীউল্লাহর রচনার পাঠভেদ ও বানানভেদের পরিচয়দানে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যৌবনে রাজনীতি বা কোনো প্রকার রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত না করলেও জীবনের শেষপর্বে—প্যারীতে বাসকালে নীরব, অনুভূতিবর্জিত ও প্রতিক্রিয়াশূন্য হয়ে থাকতে পারেন নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও স্বদেশবাসীর দুর্যোগ ও দুর্ভোগ ওয়ালীউল্লাহর অনুভববেদ্য চিত্তে প্রভাব বিস্তার করেছে। দশ বছর (১৯৬১-৭১) প্যারীবাসকালের শেষদিকে তিনি ৮ অগস্ট ১৯৬৭-তে পাকিস্তানের দূতাবাসের প্রথম সচিবের চাকরি থেকে ইউনেস্কোতে প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট রূপে যোগ দেন এবং ৩১ ডিসেমবর ১৯৭০ পর্যন্ত ওই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর পাকিস্তান সরকার তাঁকে ইসলামাবাদ বদলির প্রস্তাব দেন। ওয়ালীউল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে চাকরিহীন হয়ে তিনি প্যারীতেই থেকে যান। প্যারীতেই কর্মহীন অনিশ্চিত জীবনকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন, কারণ এই শহর থেকে যত সহজে ও স্বচ্ছন্দে স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিতে পারবেন, অন্যত্র গেলে তা সম্ভব নয়। পাক শাসক-চক্রের প্রতি লেখকের তীব্র ঘৃণা ও প্রতিবাদমুখর মনের পরিচয় সম্পাদক দিয়েছেন লেখক-প্রসঙ্গে (রচনাবলী, খণ্ড ১, পৃ ৩৯১), তা তিনি উদ্ধার করেছেন প্রাগুক্ত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য' থেকে। কিন্তু দেশবাসীর চূড়ান্ত বিজয় (১৬ ডিসেমবর ১৯৭১) লেখক দেখে যেতে পারেন নি, দু মাস পূর্বে প্যারীর উপকণ্ঠে তাঁর মৃত্যু হয় (১০ অকটোবর, ১৯৭১)।

সম্পাদক নিপুণভাবে দেখিয়েছেন, জীবনের শেষ পর্যায়ে ওয়ালীউল্লাহ এক সম্পূর্ণ নতুন জীবনাদর্শে ও মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ-ওয়ালীউল্লাহ স্বদেশসংলগ্ন, দেশের দুর্দশায় পীড়িত ও ক্ষুব্ধ, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। শেষ দিকের চিঠিপত্রে টুকরো লেখায় তার পরিচয় পাই।

সম্পাদক সযত্নে দুটি কাজ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ রচনালীর সমাহরণ এবং বিষয় ও কালানুক্রমিক প্রকাশ, গল্প-উপন্যাসের নানা পাঠান্তর, বানান-রূপভেদ, বাক্য-রূপভেদ সংকলন : আর ওয়ালীউল্লাহ-বিষয়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথার তালিকা প্রণয়ন। (এতে যুক্ত হবে আবদুল মান্নান সৈয়দের "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ" গ্রন্থটি, যা পরে প্রকাশিত, নভেমবর ১৯৮৬)। অবশ্যস্বীকার্য, ওয়ালীউল্লাহ-রচনাবলী - সম্পাদনায় সম্পাদক বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়া

কিরণশঙ্কর মৈত্র

'আমার মুখ দেইখ্যা কী হব্যে? ভদ্দরনোকদের পানে তাকাও, উদের মুখে লজর দাও, যাদের লেগে বুকের খুন ঢেউলে মরি, যাদের ঘরে সোনার ধান তুইলে দেই, উদের ছ্যাখো কেনে। আট আনা লগদ, এক সের চাল—রোজ মজুরি। চার মাস কাম-কাজ আট মাস ধারদেনা—সব কেনা গোলাম।'

উক্তিটি "কুরুক্ষেত্র" উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র তুফান মণ্ডলের। তার জীবনের দুঃখদুর্দশা-বঞ্চনা তার কথার মধ্যেই প্রতিভাত। এই সঙ্গে গ্রন্থের আর-একটি চরিত্র তরুণ নেতা তপন মুখুজ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—'নেতারা মুখে বলে এক; কাজ করে অন্য। তাই দেখি, নিজের নামে, দেবতার নামে, চাকরবাকরদের নামে, আত্মীয়স্বজনদের নামে, হাজার রকমের বেনামে সেই জমি দখল করে আছে কারা? যাদের টাকা আছে, টাকা দিয়ে কেনা যাদের বন্দুক আছে, টাকা দিয়ে পোষা যাদের খুনে গুণ্ডা আছে, যারা সরকারি লোকেদের দলে টানতে পারে, টাকা দিয়ে যারা উকীল লাগাতে পারে, মামলা চালাতে পারে, টাকা দিয়ে যারা কৃষকদের ঐক্য ভাঙতে পারে, কৃষকদের থেকেই কাউকে কাউকে কিনে নিজেদের তাঁবেতে রাখতে পারে। যেসব কৃষক-চাষীর জমি-জিরেত ছিল তাদেরও সর্বস্ব চলে যাচ্ছে টাকা-ওয়ালাদেরই গোলাতে। আর কাগজে-কলমের আইন কাগজে-কলমেই থাকছে—কৃষক-চাষীরা না জানে আইনের কথা, জানলেও সে নাচার, না সরকার, না থানা, না আদালত, কোনওখানেই তার পক্ষে লোক নেই।'

এই দুটি উক্তির মধ্যেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিধৃত। তরুণ, সুরুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত অশোক চৌধুরী এই পটভূমিকায় সেই দূর মফসসলে, চণ্ডীগ্রামের 'সনাতন স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে' হেডমাস্টার হয়ে এসেছে, সঙ্গে তার নব-বিবাহিতা স্ত্রী জয়তী।

চণ্ডীগ্রামে মধু দত্তের অপ্রতিহত প্রতাপ-প্রতিপত্তি—'মধু দত্তের রিকশা, মধু দত্তের বাস, মধু দত্তের সিনেমা হল, মধু দত্তের জায়গা-জমি, মধু দত্তের গদীবাড়ি, এমন কি স্কুল-ও মধু দত্তের, 'সনাতন স্মৃতি বিদ্যামন্দিরে'র সে সেক্রেটারী।'

নিজের অজান্তে অশোক এই মধু দত্তের বিষাক্ত লূতাতন্তুজালে জড়িয়ে পড়েছে, শিকার হয়েছে তার স্বার্থ-সিদ্ধির, তার স্ত্রী জয়তীকেও ভুগতে হয়েছে তার সঙ্গে। অবশেষে পদত্যাগপত্র পেশ করে অশোককে চণ্ডীগ্রাম ত্যাগ করতে হয়।

গ্রাম-জীবনের স্বার্থ-দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের রূপটি কৃতিত্বের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন লেখক। বিভিন্ন চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রয়েছে বাঙলার গ্রামসংস্কৃতির কথাও।

সুরজিৎ দাশগুপ্তের দ্বিতীয় উপন্যাসেও শ্রেণী-সংগ্রামের কথা। তবে এখানে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ যা একদা পুরো বাঙলাদেশকে উদ্বেল ও উত্তেজিত করে তুলেছিল।

বিজন বসু কলকাতা শহরতলির আধা গ্রাম্য পাড়ার সিনেমা হলে টর্চ জ্বেলে পাবলিককে সীট দেখাত। এই কাজ করেই সংসার চালাত সে। ইচ্ছে ছিল প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। ছোটোভাই বাচ্চু তখন হায়ার সেকেনডারি পড়ে।

বিজন কখনও রাজনীতি করত না, টিপিক্যাল ভালো ছেলে, কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে 'এসকেপ অপারেশনে' পুলিশের গুলিতে মারা যায় সে। তাকে শহীদ বানিয়ে দেয় একটি রাজনৈতিক দল। তারা বাচ্চুকে ওশকাতে থাকে বদলা নেবার জন্যে, কোনো একটা পক্ষে যোগ দেবার জন্যে, কারণ নিরপেক্ষতার রাজনীতিও একটা ঘৃণ্য সুবিধাবাদের রাজনীতি। অবশেষে সে তার দাদার ঘাতক সাব-ইনসপেকটর পাকড়াশিকে হত্যা করে। এরপর থেকে ঘটনাচক্র তাকে অন্য পথে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।

যারা শান্তির নির্দল পথে থাকতে চায় তাদের অসহায়তার কথা লেখক বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন—'গলির মুখ থেকে পদ্মপুকুর পর্যন্ত পুরোটা হাতকাটা রতনের এলাকা। এ মাস্তানদের দৌড় এই পর্যন্ত।'

'বিপদ আমাদের। না ঘরকা, না ঘাটকা।'

'…রোজ যে এত বোমা-গুলি চলে, এত লাশ পড়ে, দেওয়ালে দেওয়ালে খতমের খতিয়ান—এর মধ্যেই তো আমরা বেঁচে আছি, যাচ্ছি-আসছি, কাজকর্ম, বাজারহাট সবই চলছে। সিনেমা হল-এও ভিড় হচ্ছে, বাচ্চুর ফুট খেলাও ঠিক আছে।'

জঙ্গলের মধ্যে "মুক্তির দেশে" বাচ্চুর ট্রেনিং হয় সশস্ত্র সংঘর্ষের, পুলিশের সঙ্গে একদিন "অ্যাকশন"-ও হয়। সৌভাগ্যক্রমে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে না সে, কিন্তু তার বিচার হয় "বিপ্লবী আদালতে"—চিনুর হাতে থাকবে এই রিভলবারটা—ফুললি লোডেড। দশ সেকেণ্ড হলেই চিনু ফায়ার করতে শুরু করবে—ছটা চান্স। তার মধ্যে তুমি যদি পালাতে পারো তো বেঁচে গেলে, না হলে—'

বাচ্চু পালাতে পারে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে একটি গাছকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। তারপর গাছের উপরে উঠে—'ডালটা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে সাবধানে, খুব সাবধানে বাচ্চু পা দুখানা নামিয়ে দিল, কিন্তু কোথাও পৌছল না, শূন্যে ঝুলতে লাগল। বাচ্চু নিজের কানে শুনতে পেল, অনেক দূরে অন্য এক বাচ্চু ডেকে-ডেকে বেড়াচ্ছে, 'পান্না, পান্না।'

অন্য এক গ্রামে অজ্ঞাতবাসের সময়ে যে-বাড়িতে থাকত, সেখানকার যে কিশোরী মেয়েটিকে সে ভালো-বেসেছিল তার নাম 'পান্না'।

লেখক এই শূন্যতার মধ্যেই "পরিচয়" উপন্যাসটি শেষ করেছেন। বিষয়বস্তুর মধ্যে যে-ব্যাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তাকে তিনি প্রসারিত করেন নি। ফলত, বাচ্চু ছাড়া অন্য প্রধান চরিত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবার সুযোগ পায় নি। একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠার একটি বইয়ের মধ্যে যথাসম্ভব বাঙলাদেশের একটি উত্তাল অস্থির অগ্নিময় অধ্যায়কে বিধৃত করার প্রয়াস করেছেন লেখক।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর-কোনো লেখা আমি আগে পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

কিন্তু পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার এই ছোট্ট উপন্যাস, "অন্য জীবন" আমায় আকৃষ্ট করেছে।

লেখকের সতেজ প্রকাশভঙ্গি, কবিত্বময়তা 'উজ্জ্বল রোদে স্বচ্ছ রাজপথ আয়নার মতো ধরে দিচ্ছে এক-একটা মুখ।' প্রধান চরিত্র সুনুর চারপাশে আরও কয়েকটি নারী-পুরুষ—ব্রতী, পৃথা, অতীশ, ধ্রুব, শ্যামানন্দ—দু-একটি কথার মধ্যেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আপন বৈশিষ্ট্যে। বর্ণনার মুনশিয়ানায় বাড়ি, রাস্তা, বাস-ও বিশিষ্ট চরিত্র হয়ে ওঠে—

১. 'ধার্মিক বকের মতো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে অপেরা পার্টির বাড়িগুলো।'

২. 'করুণ ধ্বান তুলে চলে যাচ্ছে শেষ ট্রাম। রাতের কলকাতা মাঝে মাঝে বড় মায়াবী হয়ে যায়। ফুটপাথে মানুষ। পাতার আগুন ঘিরে ঠাণ্ডা হাত। উতলা বাঁশি বাজিয়ে চলে যাচ্ছে এক ক্লান্ত সাপুড়ে। রিকশায় মাতাল। ফুটপাতে বিশাল-বপু এক পুরুষকে মাসাজ করে যাচ্ছে এক

কুরুক্ষেত্র—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা-৬। চোদ্দ টাকা।

পরিচয়—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা-৬। পনেরো টাকা।

অন্য জীবন—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। অরিত্র প্রকাশন, কলকাতা। দশ টাকা।

আয়ত্ত—রণিত বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুবনলক্ষ্মী প্রকাশনী, কলকাতা-৬। দশ টাকা।

শীর্ণ বালক।'

সুমু এক অন্য জীবনের স্বপ্ন দেখেছে—সে পালাতে চেয়েছে 'এই শহর—এই পরিবেশ—মানুষজন—সব কিছু ছেড়ে'।

দয়িতা ব্রতীর প্রশ্নের জবাবে সে বলেছে যে পালিয়ে কী লাভ তা সে জানে না, 'কিন্তু যে জীবনটা আমি যাপন করি, যে পরিবেশ আমাকে ঘিরে রাখে, সেখান থেকে এই জোরটা আমি পাই না—বাঁচার জন্যে—শুধু বাঁচার জন্যেই আমি পালাতে চাই'—

গ্রন্থশেষে 'সংযোজন : লেখকের কথা'-অংশের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এই উপন্যাসিকায় জীবনের ভগ্নাংশমাত্র প্রতিফলিত। লেখকের কাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের প্রত্যাশা রইল।

"আয়তী" উপন্যাসের উপাদান বিমল মিত্রের হাতে পড়লে নিঃসন্দেহে একটি সুবৃহৎ আকর্ষণীয় উপন্যাস হয়ে উঠত। তো বিমল মিত্র একজনই।

'ফুলমার চিৎকার শেষ হওয়ার আগেই বিশাল হলঘরের আলোগুলি নিভে যায়। সামনের ছোট্ট মঞ্চটার লাল পর্দাটা ধীরে-ধীরে সরে যেতেই গোলাপী চাপকানের ওপর গোলাপী ঘাঘরা ও ঝকমকে সুন্দর কাঁচুলি পরা একজন মাহলা মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সবাইকে কুনিশ করে। চারপাশে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসে থাকা ওস্তাদজীরা তখনও নিজেদের সুর মেলাতে ব্যস্ত।

'মহিলা ধীরে ধীরে মঞ্চের মাঝখানে রাখা লাল-নীল রঙের তাকিয়ার ওপর ঠেস দিয়ে বসে পড়ে। তারপর আস্তে করে মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দেয়। চারপাশ থেকে অনেকগুলো আলো একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। আলোর ঝলকানিতে সুন্দর মুখখানা অষ্টমীপুজোর রাত্তিরে দেখা দুর্গাপ্রতিমার মত চকচক করে ওঠে। এত রূপ সুরঞ্জন গল্প উপন্যাসে পড়েছে। সামনাসামনি কোনদিন দেখে নি।'

এই নারী কিন্তু সুরঞ্জনের ছেলেবেলার খেলার সাথী—গরিমা সিং, বর্তমানে বেনারসের বিখ্যাত বাঈজী, বিবিজান। কিন্তু 'বাঈজী, বেশ্যা না। মুজরা নাচি, ইজ্জত সওদা করি না।'

সুরঞ্জনের ডাক্তারি জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মহেশ। মহেশের দাদার ছেলে হওয়ায় 'গানবাজনার ব্যবস্থা হয়েছে' এবং মুজরাতে এসেছে ফুলমা এবং বিবিজান। সুরঞ্জনের সঙ্গে এইভাবে তার বাল্যসখীর আবার দেখা বিহারের মুঙ্গেরে। দেখা হবার পর থেকে বিবিজান আর সুরঞ্জন ছ-রাত ধরে গঙ্গানদীর ধারে এবং মহেশদের প্রাসাদে বসে কথা বলেছে, এবং উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাদের জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী। সুরঞ্জন ইতিমধ্যে লনডন থেকে এফ. আর. সি. এস. করে এসেছে। গরিমার জীবনে ঘটে গেছে নানা উত্থান-পতন। তাদের সে-কাহিনী অনার্কষণীয় নয়। লেখকের ভাষাও ঝরঝরে।

জীবনের গভীরে অবগাহন করে লেখক ভবিষ্যতে মণিমুক্তোখচিত উজ্জ্বল জীবন-আলেখ্য উপহার দেবেন —এমন আশা সম্ভবত দুরাশা নয়।

বিচিত্র স্বাদের একগুচ্ছ কবিতার বই

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

এইসব আধুনিক কবিদের নতুন গ্রন্থে প্রতিশ্রুত সম্ভাবনা পাওয়া গেল, সেটাই আনন্দের। অগ্রজ কবি বীরেন্দ্র গুপ্তর "রাজার গাড়ি" কাব্যগ্রন্থে আমরা অন্য এক অনুভবের ছোঁয়া পাই। 'যখনই বেড়াই-ঘুরি, এখানে ওখানে ফিরে, তখনই পাশে ছায়ার মতন কে যেন হাঁটছে / আমায় ডাকছে, অথচ বুঝেও বুঝতে পারি না।' এই পাশাপাশি ছায়ার মতো যে ক্রমাগত হাঁটে, তাঁকে শনাক্ত করতে না পারার শঙ্কা তাঁর কবিতাকে রহস্যের প্রতীকী বোরখায় চিহ্নিত করে। আমৃত্যু সংশয় তাঁর কবিতাকে অন্যমাত্রায় উত্তীর্ণ করে। 'সূর্যের একটানা ভ্রূকুটি শাসনে মাটি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল···এই মৃত্তিকা খোলাভাঙা বাদামের পিঠ।' চিত্রকল্পের এই খেলা মনস্ক পাঠককে অন্য এক আকাশের সন্ধান দেয়। এখানেই কবির সার্থকতা।

"পরিস্রুত অন্ধকার" গ্রন্থে পরিমল চক্রবর্তীর অনেক কবিতা আমাদের চেতনার গভীরে আলোড়ন তোলে। রোমানটিক এই অগ্রজ কবির মূল প্রত্ন ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত, ফলত চিত্রময় গীতল কাব্যের চারিত্রলক্ষণ বহন করে। কবি তাঁর পঞ্চম কবিতাগ্রন্থে অন্ধকার জীবনকে পরিস্রুত করে দীপ্ত আলোকের সন্ধানে ঘুরেছেন। কখনো সেই কাঙ্ক্ষিত সফলতা তিনি পেয়েছেন, কখনো বা অন্ধকারকে ছেনে শেষ পর্যন্ত আলোর উৎসে ফিরতে না পেরে অপ্রেম, বিষাদ আর সন্তাপেই প্রত্যাহত হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। 'কেন না মানুষ আজও মানুষকে প্রগাঢ় প্রীতিতে / কাছে টেনে, বুকে বেঁধে তৃপ্ত করে হৃদয়ের সাধ' (স্মৃতি)। তবুও মানুষের স্বপ্নসাধ শোকের পাথরে ঠুকে শেষ হয়ে যায়—'সমর্পিত দিনরাত্রি মুছে যাক, স্বপ্নহননের সব চিহ্ন ধুয়ে যাক, অপ্রেমের গভীর ব্যথায় নিজেকে রাঙাবো আমি, যেমন রাঙায় নীলাকাশ দিনান্তের ম্লান সূর্য, আমি আজ মৃত্যুকেই চাই' (অবসান চাই)। পরিমলবাবুর রোমানটিক মেজাজের চিহ্ন ছড়ানো থাকে এরকম পংক্তিতে—'তবুও স্মৃতির শঙ্খ বাজে···হয়তো এখনো তাই তাকে মনে পড়ে—একদা যে ফিরে গেছে একা একা গান গেয়ে সন্ধ্যার প্রহরে'। নিসর্গ, প্রেম আর প্রেমহীনতা থেকে বেদনা নিঙড়ে কবি যেন নিজেকেই নিবেদন করেন প্রাক্তনের সান্ধ্য উপকূলে। যিনি সহজ অনুভূতিকে সফল চিত্রকল্পে প্রাণবন্ত করে তোলেন, তাঁর কাছে সময়ের প্রত্যাশা নিরন্তর জেগে থাকে।

রাজার গাড়ি—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত। উচ্চারণ, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩। ১৯৮০। দশ টাকা।

পরিস্রুত অন্ধকার—পরিমল চক্রবর্তী। পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। ১৯৮৮। বারো টাকা।

স্বগত সংলাপ—কৃষ্ণানন্দ দে। কবিতা কাগজ, মেদিনীপুর। ১৯৮৮। আট টাকা।

জন্মসূত্রে দলভুক্ত আছি—ঈশ্বর দত্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ১৯৮৫। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রুকুষুকুর প্রথম পাঠ—ঈশ্বর দত্ত। এখন রোদুর সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ৬১। ১৯৮৮। তিন টাকা।

অলৌকিক নক্ষত্রে দাঁড়িয়ে—রমলা বড়াল। গগমন প্রকাশন, কলকাতা-৫০। ১৯৮৭। ছয় টাকা।

জলপ্রবাহে পদচিহ্ন—ইদ্রিস মহম্মদ। সৃজন, ঢাকা। ১৯৮৮। কুড়ি টাকা।

অন্তর্গর্ভের গন্ধারা—অজিত বসু। সীমান্ত, কলকাতা-৬। ১৯৮৮। ষোল টাকা।

খণ্ডচিত্রমালা সাপুইপাড়া—রত্নাংশু বর্মী। গড়িয়া, চব্বিশ পরগনা (দক্ষিণ)। ১৯৮৮। দুই টাকা।

আত্মার কণ্ঠস্বর—মহমুদুল হক। শিল্পকলা, সি২ ২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা ৭। ১৯৮৪। আট টাকা।

রাত্রিরথ—নিতাই জানা। কালবেলা, মেদিনীপুর। ১৯৮৮। আট টাকা।

কবিতার তীর্থে আমাদের দীর্ঘদিনের সহযাত্রী কৃষ্ণানন্দ দে তাঁর সাম্প্রতিক কবিতাগ্রন্থ "স্বগত সংলাপ"-এ স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন। 'এখন সূর্যের পাখি নিজস্ব কুলায় শিশির সান্ত্বনা নিয়ে আগামী দিনের যন্ত্রণা-সঙ্গীত সিক্ত ধূসর-সন্ধ্যায়/সনাক্তীকরণে মগ্ন শীতার্ত শবের।' তৎসম এবং অতিরিক্ত শব্দযোজনার ভার সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় ধ্রুপদী বাঁধন টের পাওয়া যায়। স্থৈর্যের সূর্য তপশ্চর্যায় আজীবন মগ্ন থাকেন কবি। এরকম পংক্তি পাঠককে গভীরের স্পর্শ দেয়—'ফাল্গুন এলেই ভীরু শিমুলের বক্ষোফাটা আমন্ত্রণ ওড়ে।' কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশরীতির কথা অনিবার্যভাবে মনে পড়লেও, তৎসম তদ্ভব শব্দ তাঁর কবিতায় মিলেমিশে এক নিজস্ব আবহ সৃষ্টি করে। বসন্ত যখন শেষ হয়ে আসে, প্রকৃতিতে চেতনায়, জীবনে আসে শীতার্ত রাতের রুক্ষ চাবুকে কঠিন যন্ত্রণা আর অবসাদ, তার কোনো উপশম মেলে না কোথাও। 'তিরিশ বসন্ত এসে জমেছে যেখানে রাত্রিদিন / সেখানে হৃদয় ছিল ফুল পাখি আবিশ্ব আলোক'—সেই আলোর সমর্পণের বার্তা আমাদের আত্মার অন্ধকারে সংক্রামিত হয়। সেই স্তব্ধ গভীর বিষাদ সম্ভবত কবিতার শাশ্বত বিষয়। কবিতায় সেই অতিমাত্রিক ক্রান্তিকাল আমাদের হৃদয়ের আততি হয়ে স্পন্দমান থাকে সেই শুদ্ধতার অমেয় ভোরের দিকে। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় কবে আসবে সেই চিরায়ত আলো, যা আঁধারের অধিক, আবহমান কালের গণ্ডিতে যা প্রসারিত করে দেবে নিজেকে? কবিতা এক ভয়ংকর শানিত অস্ত্র, যা সততই তার স্রষ্টাকে ভুলের জন্য, অবহেলার জন্য ক্ষমাহীন খণ্ড-বিখণ্ডিত করে। এই অন্তিম সত্য কবির পক্ষে মনে রাখা অসম্ভব জরুরি শর্ত।

ঈশ্বর দত্ত যখন শুরুতেই উচ্চারণ করেন, "জন্মসূত্রে দলভুক্ত আছি" এবং ভূমিকায় কবুল করেন 'মানুষের পায়ের চলার ছন্দে জেগে উঠছে আমার কবিতা', তখন স্বভাবতই আমরা আগ্রহ আর আশঙ্কায় যুগপৎ আন্দোলিত হই। 'আসুক আঘাত আরো তীব্র ভয়ংকর/ রক্তমূল্যে তবু ভোর, অন্তিম সকাল দেখা দেবে'—এই সরল বিশ্বাস সত্য হোক। ভোরের শুদ্ধতার দিকে দূরগামী মানুষের মিছিলে কবির সঙ্গে শামিল হতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু অসংখ্য মানুষের স্বপ্নবাসনা কণিকে যখন কয়েক পংক্তিতে তুলে ধরতে হয়, তখন অনেক-খানি সংহত শক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়। সেখানে অকুলান হলেই কাব্যসরস্বতী মুখ ফেরাতে দ্বিধা করেন না। যেহেতু কবিতা কোনো বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, এক অখণ্ড নির্মাণ তার অস্থিই, তবু 'কিছুই যখন ভালো লাগে না তখন তুমি / তোমার কথা ভাবতে গিয়ে··· আরেক দ্বীপে' ভালো লাগে, আমাদের তৃপ্ত করে। ঈশ্বরের "রুকুসুকুর প্রথম পাঠ" কিশোরদের জন্য রচিত কবিতার সংকলন, কবির আরেকটি সত্তাকে উন্মোচিত করে। 'মা বললেন টুয়ারে তুই / বাইরে এখন যাস না / ওই ওদিকে বসে আছে ঘাপটি মেরে হাঁ করা এক হায়না। টুয়া বলল—ইস / তার সাথে যে সই পাতালুম কাল। / মিথ্যে ভয় দিস।' শিশু কেন, বয়স্ক মনকেও সমান আকর্ষণ করে। এর প্রতীকী ব্যঞ্জনা নিঃসন্দেহে শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। এই বইটির 'ময়ূরপঙ্খী ভাসছে জলে' ও আরো অনেক কবিতা সার্থক রচনা, সন্দেহ নেই।

'বৃষ্টি ঢাল এলোচুলে আঁধি তুলে / বিদ্যুৎ নাগিনী নিয়ে খেলে / গান গায় বেদেনী ভাষায় / জাদু তার বৃথা চলে যায়। বীজ নেই ফসল ফলে না।' রমলা বড়ালের "অলৌকিক নক্ষত্রে দাঁড়িয়ে" কবিতাগ্রন্থে সহজ শব্দের চিত্রকল্প প্রায়শই নির্ভুল কবিতাতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়। শব্দের সহজ মহিমায় কবি নিজেকে মেলে ধরতে পারেন কাব্যের শরীরে। 'ভালোবাসা হৃদয়ের মেঘ রৌদ্রে ওঠা এক শান্ত রামধনু, প্রান্ত থেকে দিগন্তকে সেতুর মতন ধরে রাখে': এরকম পংক্তিতে শব্দ স্পর্শময়তা থেকে

শব্দাতীত কবিতায় সঞ্চারিত হয়ে যায়।

"জলপ্রবাহে পদচিহ্ন" বইটিতে কবি ইউসুফ এক সমাজসচেতন অথচ মেদুর বিষণ্ণতানির্ভর শান্ত কবি-ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখেছেন। 'ওখানে খড়ের ঘরে মানুষের মতো বসবাস করে কিছু তেলাপিয়া পাখি,/ মানুষের কণ্ঠ বাজে কানে অথচ কোথাও কেউ নেই / পদচিহ্ন তার' এই কবিতায় মানুষের হৃদয়ের অন্ধকার উৎসকে চকিতে স্পষ্ট করে হারিয়ে যায়—'সে আছে আমার; তাকে কখনো দেখিনি/নাম নেই, ডাকি—সব-কটি প্রিয় নামে'—এরকম বাক্‌প্রতিমায় তিনি মানুষের মৌল অস্তিত্বের বিষণ্ণতায় অবগাহন করেন। সম্পূর্ণ অসহায়তার শূন্য কুয়োয় নেমে যেতে যেতেও, সে আছে আমার এই বোধ তাঁকে মৃত্যুগহিন জীবনের ভেলায় ভাসিয়ে রাখে। নাস্তির অন্ধ নাব্যতা-হীন সমুদ্রে এই ভাসমানতার আর্তি অসামান্য, কারণ 'ঘুরতে-ঘুরতে এসে যাই / গঙ্গা-যমুনার অববাহিকায় ···দেখি তুমি নেই তোমার বাঁহাত সন্ধি হয়ে মুঠোর ভেতর কাঁপে।' ইউসুফ আরো লেখেন, লিখতে পারেন 'সে আসে বাতাস নেড়ে আকাশে আগুন দিয়ে কোন সন্ধ্যা যখন ছবির মতো'। উপমা ও কাব্য-ভাষায় নিজস্বতার স্বাক্ষর বহন করে তাঁর কবিতা।

সাম্প্রতিক কবিতাগ্রন্থ "অন্তর্গর্ভের গম্ভীরা"র অজিত বসু একাধিক কবিতায় আন্তরিক উচ্চারণে সুন্দর পরিবেশ রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা ঐতিহ্য-অনুগামী ও লিরিকধর্মী—'পুজা, সে তো প্রদক্ষিণ / অন্তহীন আরতি পরিক্রমা / পূর্ণ প্রেম।' প্রেম আর পুজার মেলবন্ধনে তাঁর কবিতা অস্তিবাদের প্রসন্নতায় বিন্যস্ত। কিন্তু তৎসম শব্দের শৃঙ্খলাহীন আতিশয্য পাঠককে ব্যথিত করে। মিতভাষণ ও সংযত চিত্রকল্পে তাঁর কবিতা ভিন্ন মাত্রায় তীর্ণ হতে পারত সহজেই।

রত্নাংশু বর্গীর নতুন কবিতার বইয়ের নাম "খণ্ড-চিত্রমালা সাঁপুইপাড়া"। অন্য ধরনের কবিতার রূপ ও আদল খুঁজেছেন তিনি। তাঁর অনুসন্ধান প্রায়ই উপলব্ধির অধিষ্টভূমি খুঁজে পায় নি। অথচ অবকাশ ছিল সহজ হবার—'অন্ধের জমিতে ঘাম, গোলায় ফসল···ভোরের আগেই এরা ভোর দেখে'। কিছু আঞ্চলিক কথ্য ডায়ালেক্ট ব্যবহার করতে গিয়ে বহু কবিতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অথচ 'কত রাজা আসে যায় ইতিহাসে / ঈর্ষা আর ক্রোধ আকাশ বিষাক্ত করে / আর মানুষ বসে থাকে মৃতদেহ হয়ে'—এরকম উচ্চারণে গভীরতার ইঙ্গিত স্পষ্ট লেখা থাকে।

"আত্মার কণ্ঠস্বর" গ্রন্থে মহমুদুল হক নিজস্ব পরিবেশ ও সমাজকে কবিতায় আত্মস্থ করেন সহজেই। শোষণের প্রহারে লাঞ্ছিত মানুষ তাঁর লজ্জিত মুখ তুলে ধরেন কবিতার ফ্রেমে। দুঃখিত সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে মিশে তিনি আশ্রয় চান মাতৃস্নেহের কোমল অঞ্চল-ছায়ায়। আত্মার নানান কণ্ঠস্বর বিভিন্ন কোণ থেকে ছুটে এসে অন্য এক মাত্রার জগৎ গড়ে তোলেন তিনি। যখন শেষ কবিতায় তিনি বলেন—'মাটি ঘাম ফুল এবং কিছু চুল অনাদৃত অনাবৃত পড়ে থাকে / সভ্যতার বাঁকে'—তখন তাঁর ক্ষোভশ্লেষের চাবুকে খরশান হয়ে ওঠে। আমাদের ক্ষোভ, কবিতায় বারবার অজস্র অতিরিক্ত শব্দ কবিতার সংহতি বিনষ্ট করে। মিত-বাকের সীমায় বাঁধতে পারলে তাঁর কবিতা আরো অর্থবহ হত।

'প্রতিধ্বনি জলে ভাঙে, প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, ফেরে না পাটনী / ফেরে না সে ফেরিওলা, কলোচ্ছ্বাস, কলোচ্ছ্বাস···' অথবা 'রূপের ঝরোকা নদী ডাকে কালো চোখ তুলে, গভীর নিশ্বাসে টেনে নেয়; আলোক আঁধার জল হ'লো না পারানি'—এরকম অসাধারণ পংক্তি সনেটের আঁটোগ্রন্থিতে বেঁধে নিতাই জানা আমাদের চেতনায় দাগ রেখে যান। প্রকৃতিকে প্রতীকে সঞ্চারিত ক'রে তাকে টেনে নেন পরা-

বাস্তবতার অর্ধোজ্জ্বল আচ্ছন্নতায়। তাঁর 'রাত্রিমথ' কবিতাগ্রন্থে এরকম অনেক কবিতা গোধূলির বর্ণালোকে মায়াময় ছড়ানো থাকে। বইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় 'ব্রজপদ' অংশেও উপমা একইরকম দীপ্ত থাকে শব্দকে অনায়াসে ব্যবহার ক'রে তার ব্যঞ্জনাকে জ্বালিয়ে—'আহা, মগ্ন কালো রাত্রির মাথায় বিচূর্ণ ফাগের স্পর্শ, ভেসে যাওয়া তুমি তো সীমায় তখনো দাঁড়িয়ে আছো, আদিগন্ত পলাশ কুয়াশা···'। তবু পাঠকের একটা অতৃপ্তি থেকেই যায়। বইটির সবকটি কবিতায় সনেটের মাত্রাতিরিক্ত বন্ধনের চাপ কবিতার সমগ্র রূপকে প্রায়শ ক্ষুণ্ণ করেছে। ফলত, প্রথম কবিতা 'ঘট' এবং আরো কিছু কবিতা প্রতীকবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অসম্বদ্ধ মনে হয়েছে। অর্থহীন আড়ষ্টতায় নিজেকে না জড়িয়ে ছন্দোহীন দায়শূন্য মুক্তিতে অনায়াসে প্রসারিত করে দিতে পারেন।

শ্রীঅরবিন্দ

সন্তোষকুমার দে

পণ্ডিচেরিতে ফুলের রাজ্য, শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে মর্মরবেদী ফুলের আলপনায় আচ্ছাদিত; ভোজনকক্ষে মায়ের প্রতিকৃতির সুমুখে স্থালীপাত্রে ফুলের প্রসাদ যেন অন্নব্যঞ্জনের মতো উৎসৃষ্ট।

এত বিচিত্র ফুলের সমারোহের মধ্যে একটি ছোট্ট নীলপদ্মের গাছ অরবিন্দভবনের প্রবেশপথে ক্ষুদ্র ফুলবাগিচার উপলখণ্ডে রচিত কৃত্রিম জলাধারের মধ্যে সবুজ পাতা ভাসিয়ে হাসিমুখে নীলপদ্ম ফুটিয়ে যে স্বর্গীয় শোভা বিস্তার করতে দেখেছিলাম—সেটির কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ছে। রামচন্দ্র নাকি দেবীদুর্গার অকালবোধনে নীলোৎপলে অর্ঘ্য দিতে গিয়ে একটি ফুল কম পড়ায় নিজের অক্ষি উৎসর্গ করতে উদ্যত হলে দেবী দুর্গা আবিরভূত হয়ে তাঁকে নিরস্ত করেন। নীলপদ্মের কথা শাস্ত্রগ্রন্থে পড়েছি, চোখে দেখলাম প্রথমে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গিয়ে।

কেন জানি না, সেই দুর্লভ ক্ষুদ্র ফুলটির সঙ্গেই তুলনা করতে ইচ্ছা হয় "শ্রীঅরবিন্দ : একটি দিব্য-জীবন" গ্রন্থখানির। অজু মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির প্রচ্ছদচিত্রে শ্রীঅরবিন্দের এমন এক-খানি বিস্ময়কর রেখাচিত্র মুদ্রিত হয়েছে যাতে তাঁর দুটি আয়ত অক্ষিও কি শ্রীরামচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত নীলোৎপলের কথাই স্মরণ করায় না? বস্তুত চিত্রে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ মুখাবয়বের পরিবর্তে ভাস্বর চক্ষু-যুগলকেই যেন বিশেষ করে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—তা অত্যন্ত অর্থবহ মনে হয়।

তবে গ্রন্থখানিকে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলে দাবি করা হলেও তা যে বস্তুত অতি সংক্ষিপ্তসার, সেটা গ্রন্থের আয়তনেই বোঝা যায়। কিন্তু গ্রন্থকার যে অসীম অধ্যবসায় নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনা, রচনা ও অনুভূতির সারাংসার পাঠককে দুটি প্রচ্ছদের মধ্যে মাত্র ১৩৮ পৃষ্ঠায় উপহার দিয়েছেন তাকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে ইচ্ছা করে 'স্বর্ণমুষ্টি'। তাই এই মুষ্টিভিক্ষাকেও মহার্ঘ মনে হয়।

শ্রীঅরবিন্দ নিজের বিষয়ে নিজে কিছু-কিছু লিখে গেছেন। কিন্তু তাঁর বিশাল রচনার তুলনায় আত্মকথন অতি সামান্য। সেটুকুর উপর নির্ভর না করে লেখক শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ে বহু সাধক, গবেষক ও মনীষী গ্রন্থকার যেসব অগণিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, শ্রীমা যা লিখেছেন এবং শ্রীমা-র বিষয়েও গুণিজনেরা যেসব আলোচনা করেছেন—সব কিছু হতে বেছে-বেছে উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করে অজু মুখোপাধ্যায় তাঁর এই মহৎ কর্মটি যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা করেছেন।

কিন্তু যাঁরা সাধারণ পাঠক তাঁদের পক্ষে ছাপার ভুলের জন্য গ্রন্থখানি পাঠ করতে পদে-পদে হোঁচট খেতে হয়। তার কারণ এই নয় যে, বাঙলা বইতে ছাপার ভুল থাকে না; থাকে—তবে তার পরিমাণ

শ্রীঅরবিন্দ : একটি দিব্যজীবন—অজু মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ মন্দির, কলকাতা-৭০। আঠারো টাকা।

এত বেশি নয় যে পাতায়-পাতায় একই ভুল ছড়ানো থাকবে। মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, আদৌ কোনও প্রুফ না দেখেই বইখানি ছাপা হয়েছে কিনা। অভিযোগ আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের নিজস্ব প্রকাশিত বই চোখে পড়ে। বস্তুত শ্রীঅরবিন্দ-সাধনার একটি অঙ্গই যেন 'পারফেকশান'-এ পৌঁছানো; সে শুধু অধ্যাত্ম-সাধনাতেই নয়, দৈনন্দিন জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই। তাই আমরা দেখতে পাই, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের প্রকাশিত বাঙলা বইয়ের 'মান'-ও নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উচ্চ, পরিশীলিত, মার্জিত এবং নির্ভুলতার মানদণ্ডে একটি আদর্শ স্থাপন করেছে বলা চলে। সেখানে শ্রীঅরবিন্দ বিষয়ক আলোচ্য বইখানির মুদ্রণপ্রমাদের অজস্রতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হয়।

উদাহরণ তুলতে গেলে আলোচনাটাই দূষিত হবার আশঙ্কা, কেবল একটি অন্য প্রকার ভুলের প্রসঙ্গ তুলছি। ৩৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে এক ইংরেজ সান্ত্রী শ্রীঅরবিন্দকে কোর্টে বলেছিলেন Abrindo, you are caught at last। এখানে লেখক Abrindo বলবার বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—(Aurobindo বলতে **পারতেন** না সে)। এটাও কি ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্য? না, ইংরেজ সেপাইয়ের বিষয়ে বলতে গিয়ে লেখক নিজের বাঙালিত্ব বিসর্জন দিয়েছেন?

গোড়ায় বলেছি, বইখানি পড়লে বহু বড়-বড় বই পড়বার ফল পাওয়া যায়। বরং তাই হু-একটি উদাহরণ তুলে এই আশা নিয়ে শেষ করি, পুনর্মুদ্রণে লেখক পাঠকদের প্রতি সদয় হয়ে যেন একটু প্রচলিত বানানই ব্যবহার করবেন। তাঁর বক্তব্য 'বিশদ' করতে চেয়ে বার বার 'বিষদ' করে না ফেলেন।

লেখক যেসব স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন তার দু-একটি তুলে দিচ্ছি—

'বিবর্তনের আর এক পর্যায় হল ভগবানের অবতার রূপে অবতরণ। অবতার হল মানুষের আধার ও প্রকৃতিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব। তার এক লক্ষ্য হল ধর্মের রক্ষা কিন্তু আর এক লক্ষ্য হল মানুষকে ঈশ্বরত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া যাতে মানুষেরও দিব্য স্বভাব লাভ হয়, মানুষ দিব্যত্বে পৌঁছায়। তা যদি না হয়, কেবল ধর্ম রক্ষা বহুজনের দ্বারাই হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট আসেন যাতে তাঁদের আদর্শে মানুষ **'আনুপ্রাণিত'** (এটা ছাপার ভুল কি?) হয়ে দিব্যত্বে পৌঁছাতে পারে। অবতার নিজে সে কাজে সহায়তা করেন।' (পৃ ১৩০-১৩১)

'এখন আমরা বিবর্তনের মহাসন্ধিক্ষণে এসে পৌঁচেছি যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "বিবর্তনের সংকট।" ···বিশ্বপ্রকৃতির বহু শক্তি ও সম্ভাবনাকে মানুষের পায়ের তলায় এনে ফেলেছে বিজ্ঞান, কিন্তু তার অন্তর যোগ্যতার তুলনায় যে আয়োজন এত বৃহৎ, উপকরণ এত বেশি যে এসব যদিও আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় মানুষের উন্নতি, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, আসলে এই বুঝি তার সব চেয়ে বড় অন্তরায় প্রকৃতির উন্নতির; চেতনার উত্তরণে পশ্চাৎটান। এসব আজকের 'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রনাথের ভাষার। আরও অনেক মনীষী প্রায় একই ভাবে বুঝেছেন এই বাস্তব সভ্যতার রোগ।' (পৃ ১৩২)

"পৃথিবীর পরিবেশে অতিমানস চেতনা পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর দিব্যমানব অযোনিসম্ভূত হবে, দেখে-ছিলেন তিনি। তাদের শরীর এত নমনীয়, স্বচ্ছ ও আলোময় হবে যে ইচ্ছায় তারা প্রায় সব কিছুই করতে পারবে। পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনের জন্যে কথা বা স্পর্শ প্রায় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। দেহধারণের জন্য খাদ্যাদি গ্রহণও অত প্রয়োজনীয় হবে না।' (পৃ ১৩৪)

ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কষ্ট করে পাঠ সমাপ্ত হলে তাই সে কষ্ট সার্থক মনে হয়। শ্রীমায়ের ছবির তলায় লেখাগুলি কেন হঠাৎ ইংরাজিতে দেওয়া হল—গোটা বইখানা যখন বাঙলায় লেখা এবং ইংরাজি লেখাটুকু কিছু হতে উদ্ধৃতি নয়—এইসব খুটিনাটি অরুচিকর বিভ্রান্তিকর বিষয়ের কথা তখন আর মনেই থাকে না।

পদ্মাপারের ছবি

সমীর ঘোষ

'একই ভাষার এপারে যে বাংলাদেশ, ওপারেও সেই বাংলা। তবু রাষ্ট্রগত কারণে আজ তারা দুই আলাদা দেশ। মধ্যিখানে ভাষা নামের নদী, দুকূলই যার সমান আদর কাড়ে। পক্ষপাতিত্বের অপরাধ আর যারই থাক, এই ভাষা নামের নদীটির নেই। সে তার পলিমঞ্জুষা দুই কূলে তুলে দেয়, শান্ত বেগ, শ্যামল তার আশীর্বাদ।...'

শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠ-কবিতা" সংকলনের প্রারম্ভিক কথনটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। বিশেষত—'এ আবহমান বাংলাদেশেরই কবিতা—সাম্প্রতিক পূর্বাঞ্চলে রচিত হচ্ছে মাত্র।'

এই ধারণা শুধুমাত্র যে কবিতা বা সাহিত্যের বিশেষ ভাবনা, তা নয়। চিত্র-ভাস্কর্য-নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে "নির্বাচিত চিত্রকলা: বাংলাদেশ"—এই শিরোনামে এক সুমুদ্রিত রঙিন চিত্রকলার অপূর্ব সম্ভার। প্রকাশক বহিঃপ্রচার অনুবিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা। মুদ্রণে সাহায্য করেছে ফাইন আর্ট প্রেস ৩৬, র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা—বাংলাদেশ। প্রকাশকাল বৈশাখ ১৩৯৫ (এপ্রিল ১৯৮৮)।

"বাংলাদেশের চিত্রকলা" এই বিশেষ নামকরণের উৎস অনুসন্ধানে যে সত্য অস্বীকার করার কোনোই উপায় থাকে না, তা হল রাজনৈতিক দেশভাগ। দেশ-ভাগের কারণেই বাংলাদেশের চিত্রকলা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বাদ পেয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির ফলেই ঢাকায় ১৯৪৮ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং আধুনিকচিন্তা-ভাবনাসমৃদ্ধ শিল্পকলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। আর এরই মধ্যে সুপ্ত ছিল আজকের বাংলা-দেশের চিত্রকলা। চিত্র-ভাবনা ও -চর্চার সূত্রপাতে যিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন—তিনি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। শিল্পী জয়নুল আবেদিন চিত্র-নির্মাণে যেমন স্বকীয়তায় বিশিষ্ট ছিলেন, পাশাপাশি সংগঠক হিসেবেও ছিলেন সার্থক। তাঁরই তীক্ষ্ণ এবং সচেষ্ট প্রয়াসের ফসল আজকের বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৭—এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান এবং স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের চিত্রকলার আলোচনা বা তার পরিচয় পেতে হলে জয়নুল আবেদিনের ভূমিকা এবং স্বরূপ জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সমকালীন চিত্রশিল্পীদের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বোরহান-উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ভূমিকায় বলেছেন, 'জয়নুল আবেদিন এখন একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে এবং একই সঙ্গে বিরোধিতা করে চিত্রশিল্পের আন্দোলন এদেশে গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনে উদ্ভাবন আছে, সেই সঙ্গে আছে প্রতিধ্বনি, তবু গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে যুক্ত হয়েছে এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক চিত্রের ধারাতে।'...(চিত্র-শিল্প: —বাংলাদেশের / বাংলা একাডেমী: ঢাকা ১৯৭৪)

সমকালীন চিত্রচর্যায় দেশকালভেদে যে সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে, তা হল দেশজ ও আন্তর্জাতিক প্রথা-প্রক্রিয়ার মধ্যে গ্রহণ-বর্জন-সমন্বয়ের সমস্যা। এপার-বাঙলার যে সমস্যা আমাদের চিত্র-শিল্পকে এক কঠিন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি নিয়ে গেছে, ওপারেও সেই একই সমস্যা শিল্পীদের চিন্তা-চৈতন্যে আর নির্মাণ-নিরীক্ষায় ব্যস্ত রেখেছে। 'আমাদের দেশ

কি আধুনিক? পশ্চিম য়ুরোপের সমস্যাবলীতে আমরা বিদীর্ণ?' —জয়নুল আবেদিনের এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ওপার-বাঙলার চিত্রশিল্পের আন্দোলনে বিভিন্ন ধারার সূত্রপাত ঘটেছে। দেশের ঐতিহ্য মূলত লৌকিক প্রথাপ্রকরণ, আচার-ব্যবহার অর্থাৎ জীবন-যাপনেই নিহিত। অথচ আধুনিক মনন তথা নিয়ত প্রগতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া কম জরুরি নয়। শুধুমাত্র লোককলার সহজ সরল সংখ্যাতবিরল প্রথাপ্রকরণে আজকের গতিশীলতায় সবাইকে আগ্রহী কিংবা উন্মুখ করে তুলতে পারছে না। চিত্রশিল্পে দেশজ রীতিই কি সব? চিত্রে শেষ পর্যন্ত যা টিঁকে থাকে সে হচ্ছে দেখবার চোখ; বস্তুকে, দৃশ্যকে, এমনকী অদৃশ্যকেও নতুন আলোয় দেখা এবং দেখাবার প্রয়াস। এবং এই প্রয়াস অন্তহীন। তরুণ প্রজন্মের এই যুক্তিপূর্ণ জিজ্ঞাসার মূল্যও কোনো অংশেই কম নয়। প্রকৃত-পক্ষে এই জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্ব বাস্তবতার সঙ্গে বিমূর্ততার নয়। বিরোধের মূলে রয়েছে শিল্পীব্যক্তিত্বের প্রকাশ-ভঙ্গিমার বিচিত্র অনুসন্ধান। নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে উদ্ভাবনী মানসিকতার নিবিড় প্রক্রিয়ায় যা যুক্ত। এভাবেই সম্ভব হয় রূপান্তরের নতুন গঠন, যুক্তিসিদ্ধ-দৃষ্টিভঙ্গি। কল্পনার ক্রমবিস্তার।

বাংলাদেশের চিত্রকলার বর্তমান যে জগৎ, তা অনেকাংশেই গড়ে উঠেছিল বিভাগ-পূর্ব কলকাতার বা সমগ্র ভারত-ভাবনার শিল্প-ঐতিহ্য থেকে। কলকাতা আর্ট স্কুলের প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য, অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর-প্রবর্তিত ও প্রচারিত শিল্পপ্রথা তথা "বেঙ্গল-স্কুল", এরই সঙ্গে চিত্রশিল্পের আঙ্গিককে আধুনিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করে শিল্পের নতুনতর ভাষা রচনায় জয়নুল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমেদ, কামরুল হাসান দারুণ প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ অনিবার্যতার হাত থেকে মুক্তি সে-সময়ে সম্ভবও ছিল না। বিশেষত আজকের বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের সেই-সকল নমস্য পুরোধা-পুরুষেরা তৎকালীন অবিভক্ত বাঙলার সামগ্রিক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন। ফলে, আঞ্চলিকতার ভিন্নতায় তাঁদের সৃষ্টিকর্মে সেই মুহূর্তে কোনো অন্য প্রভাব কিংবা ভিন্নতার প্রশ্ন বাধা দেয় নি। অথচ ঘটনার পারম্পর্যে ভৌগোলিকবিভাগ-জনিত কারণে এঁদেরই ওপার-বাঙলার শিল্পের নতুনতর গতিপথ নির্ণয়ের জন্য নেতৃত্বদানের প্রয়োজন অবশ্য-ম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা-উত্তর কালের চিত্রশিল্পই বাংলাদেশের চিত্রকলার পরিচয়ের প্রধান সময় হিসেবে চিহ্নিত। তথাপি, ভারতভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানে ঢাকা আর্ট স্কুল স্থাপনের সঙ্গে-সঙ্গেই আজকের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের চিত্র-ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটেছিল বলা যায়। এদেশের চিত্রচর্চায়—শুধু চিত্র-চর্চাই বা কেন—সমগ্র শিল্পভাবনা এবং জীবনচর্যায় প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় যে-বিষয় বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে তা—রাজনীতি। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পঞ্চাশের ভাষা-আন্দোলন, বাঙালিজাতীয়তা-বোধকে বিপুল পরিমাণে জাগ্রত করে তুলেছিল। এই উত্তাল অবস্থায় শিল্পীরাও স্বভাবতই প্রভাবিত হয়েছিলেন। চিত্রনির্মাণে তার ছাপ স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছিল সে সময়ের ছবির শরীরে। বাংলাদেশের চিত্রকলার সমালোচকরা এমন ধারণাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮-র আয়ুবি দশকের রাজনীতির প্রচ্ছন্ন প্রভাব তৎকালীন চিত্রশিল্পে ছায়াপাত ঘটিয়েছিল। এঁদের মতে, ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র, নব্যনগর-ভিত্তিক অর্থনীতি এবং বিদেশী ক্রেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা আয়ুবি দশকের চিত্রকলাকে বিমূর্ত ও প্রতীকপ্রধান রূপ গ্রহণ করতে ইন্ধন যুগিয়েছিল। এ ভাবনা অবশ্যই বিতর্কিত এবং বিশ্লেষণযোগ্য। তবু একথা সত্যি যে, ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনের পূর্বের দশকে ওপার-বাঙলার চিত্রচর্চায় বিমূর্ত অভি-ব্যক্তি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সব শিল্পীই যে এই রীতির প্রভাবে গা ভাসিয়েছিলেন তা নয়, তবু এই বিশেষ প্রভাবই সে সময়ের চিত্রের প্রধান

চরিত্রলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এই সর্বগ্রাসী বিমূর্ত রীতির প্রভাব থেকে এপার-বাঙলার শিল্প-চর্চাও সে সময় মুক্তি পায় নি।

১৯৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময় ১৯৫২-র মতোই পুনরায় বাঙালির সংস্কৃতিচেতনায় আঘাত হানে। ফলে শিল্পীদের চেতনায় প্রকাশ পায় নব্য-উদ্যম, কর্মপ্রেরণা। স্বাধীন ভাবনা বা অস্তিত্বের সঙ্কটে তাঁরা সচল হয়ে উঠলেন। শুরু হল নব-উদ্যমে সৃষ্টি-স্রোত। তারই ফলস্বরূপ ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত হল "নবান্ন" প্রদর্শনী। বাঙালির বহুলপ্রচলিত ঐতিহ্য-বাহী পার্বণকে কেন্দ্র করে চিত্রপ্রদর্শনীর এই আয়োজনের প্রেক্ষাপটে ছিল বাঙালির স্বকীয় সত্তার অনুসন্ধান আর স্বাধীন চৈতন্যের উন্মোচন। এ যেন জাতির নবজন্ম, সংস্কৃতির নবান্ন।

পিকাসো একটি উক্তি করেছিলেন,—'ধ্বংসের মধ্যেই থাকে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা।' বাংলাদেশের স্বাধীনোত্তর চিত্রকলার উদ্দাম গতি দেখে এই উক্তির সত্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহই থাকে না। ১৯৭২-এর শুরু থেকেই চিত্রচর্চার যে প্রবল উন্মাদনা ও সৃষ্টির প্রবল জোয়ার শুরু হয়, তা সত্যই অভূতপূর্ব। রাজনৈতিক উত্থান এবং স্বাধীনতার সঙ্গে-সঙ্গে চিন্তার মুক্তি এবং সৃষ্টির স্ফূর্ততাও যেন প্রকাশ পেল প্রবীণ-নবীন সকলেরই মনে।

টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত কাগমারি গ্রামে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে অন্যান্যদের সঙ্গে গিয়েছিলেন সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল। তাঁর লেখা "পূর্ববঙ্গ" নিবন্ধে মৌলানা ভাসানী সাহেবের হৃদয়স্পর্শী উক্তি আছে—'সংস্কৃতি বিনিময়ের কথাই ওঠে না, এখানে ওঠে হৃদয়-বিনিময়ের কথা। কেননা, আমাদের উভয়ের একই সংস্কৃতি ও শিক্ষা, একই ভাষা ও সাহিত্য, একই রুচি, খাদ্য ও লোকাচার, একই আশা-আশ্বাস, দুঃখ ও আনন্দ।'······

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুখ, ভাষা ঐতিহ্য সংস্কৃতির একাত্মতা সমস্ত রাজনৈতিক বেড়াকে ভেঙে-চুরে এক করে ফেলল। বেড়া ডিঙিয়ে আসতে শুরু করল ওপারের খবর। সাহিত্য-শিল্পের টুকিটাকি নমুনা আর নানা উচ্ছ্বাসের অনর্গল অভিজ্ঞতা। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৩ সালে সংস্কৃতি-বিনিময় চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের সরকারি উদ্যোগে কলকাতায় এল "বাংলাদেশ সমকালীন শিল্পকলা প্রদর্শনী" শিরোনামে চিত্রকলার বিপুল সম্ভার। ৪৪ জন শিল্পীর ১১৫টি বিভিন্ন মাধ্যম ও নির্মাণরীতির শিল্পকর্ম নিয়ে শুরু হল প্রদর্শনী—'অকাডেমী অব ফাইন আর্টস' ভবনে। ১লা নভেমবর, বৃহস্পতিবার ১৯৭৩ সাল। কলকাতার রসিক দর্শক ভিড় জমাল বিচিত্র কৌতূহল এবং প্রত্যাশা নিয়ে। শুক্রবারের প্রভাতী দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল প্রদর্শনী সংক্রান্ত সংবাদ আর শীর্ষে জয়নুল আবেদিনের আঁকা দীর্ঘ কালো-সাদার বলিষ্ঠ রেখাচিত্র। বন্যাবিধ্বস্ত হৃদয়বিদারণ দৃশ্য। প্রায় ৩০ ফুট বিস্তারী এই চিত্রের বিষয় ছিল ১৯৭০ সালে বন্যা ও ঘূর্ণীবাত্যায় তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে যে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়, তারই ভয়ঙ্কর স্থির তথ্য। সন্দীপের কাছে মনপুরা চরে গিয়ে মৃতের স্তূপ দেখে শিল্পী প্রচণ্ড আলোড়িত হন—এ তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এই প্রদর্শনীটি কলকাতা ছাড়াও দিল্লী আর বম্বেতেও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বন্ধুত্বের সাঁকো নির্মাণের লক্ষ্যেই এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। আর এপার-বাঙলার চিত্র-রসিকেরা পেয়েছিল ওপার-বাঙলার চিত্র-চর্চা ও-ভাবনার নব্য স্বাদ। এরপর দীর্ঘ সময়ের নীরবতার পর আবার হাতে এল বাংলাদেশের চিত্রকলার সুমুদ্রিত সংকলন। প্রত্যক্ষ দর্শনের যে স্বাদ ছবিতে পাওয়া যায়, তা মুদ্রিত ছবিতে পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। তবু ছবির বিচিত্র ভাবনা, আঙ্গিকের নব্য রীতি প্রণয়নের চেষ্টা এবং সামগ্রিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়া গেল। এ প্রাপ্তিও কম নয়।

"নির্বাচিত চিত্রকলা : বাংলাদেশ" শীর্ষক চিত্র-সংকলনে জয়নুল আবেদিন থেকে শুরু করে কে. এম. আবদুলকায়ুম পর্যন্ত আটাশ জন শিল্পীর শিল্পকৃতিতে এই সম্ভার সাজানো। তেলরঙ এবং ছাপের ছবির মিশ্র সংকলন বৈচিত্র্যের স্বাদ দেয়। মূর্ত-বিমূর্ত—সকল রীতির ছবিই সংগৃহীত হয়েছে এবং তা অবশ্যই শিল্পীর নির্দিষ্ট বিশেষ চরিত্রচিহ্নের কারণেই। প্রত্যেকেই বিশিষ্টতায় স্বতন্ত্র, তবু চরিত্রলক্ষণ অনুসারে কিছু বিভাগ করা চলে যেমন—সদৃশাত্মক ছবির মধ্যে রাখা যায় জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস. এম. সুলতান, শাহাবুদ্দিন আহমেদ। অথচ এই চার-জনের চিত্রকল্পেও রয়েছে আকাশ-মাটির দূরত্ব। আবেদিন সাহেবের কাজের নাম "স্নান"। নদী বা দীঘির ধারে গাছের কোলে কয়েকজন নারীর স্নান, ও স্নানের পর প্রাথমিক প্রসাধনের নানান ভঙ্গিমাকে তিনি সহজতায় উপস্থিত করেছেন। বিষয়ের বাস্তবতা-টুকুই সত্যি, কিন্তু উপস্থাপনার চাতুর্যে এ ছবি শুধু সদৃশাত্মক বর্ণনা থাকে না, হয়ে ওঠে শরীরের ছন্দোময় অভিব্যক্তি এবং উপস্থাপনে স্থানবিভাজনের খেলা। রঙব্যবহারের সূক্ষ্ম চাতুরী মন মজায়। জয়নুল আবেদিনের এ ছবিতে লৌকিক বৃত্তের বাইরে রয়েছে আন্তর্জাতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগের পরীক্ষা যা সেজানের হাতে চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছিল।

সংকীর্ণতার বাইরে এই যে আত্মীকরণের শক্তি শিল্পীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়ে তোলে। দেশজ আবহকে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়েও পাশ্চাত্য ঢঙকে রেখেছেন রেখার নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে নয়, অজস্র রেখার টানে অসংলগ্নতার মধ্যে এক অভীষ্ট গঠনকে ধরার নাটকীয় ধারায়। এই ছবির পাশে কামরুল হাসানের "নাইওর" নামের ছবি অনেক বেশি বিষয়কেন্দ্রিক এবং সোচ্চার। স্পষ্ট রেখায় বিষয়কে বেঁধেছেন। গোরুর গাড়িতে স্ত্রীপুত্রসহ চালক। চোখে-মুখে অদ্ভুত প্রশান্তি অথচ বিস্ময়াবিষ্ট আত্মমগ্নতা। দুটি গোরুর চোখমুখের ভাবেও শ্রমের ক্লান্তি আর অসহায়তা। লাল, হলুদ, নীল, সবুজ—সব উজ্জ্বল রঙের উপস্থিতি, অথচ মায়াময় পরিবেশ নিথর সবুজ সজীব গ্রাম্যতা। এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য কামরুল হাসানের ছবির একটি চরিত্রলক্ষণ, তবে এই ছবি দেখতে-দেখতে এপার-বাঙলার বিস্মৃত শিল্পী সূর্য রায়ের কথা বেশ মনে পড়ে। কোনো এক প্রচ্ছন্ন রচনারীতির সাযুজ্যে মিল খুঁজে পাই। কামরুল হাসানের ছবিতে সরল গ্রাম্যতা বা কাব্যিক সুষমা থাকলেও রেখা সবক্ষেত্রেই সমমাত্রা বা নির্দিষ্ট চরিত্রের নয়। বিষয়ের বাস্তবতাকে তিনিও আধুনিক চিত্রতত্ত্বের আদলে গড়েছেন। ফলত, বিষয় ও রঙ পরিচিত হলেও বস্তুরূপের যথাযথ অস্তিত্বের সদৃশাত্মক চিহ্নবর্জিত অথচ সার্বিক ভাঙনেও ভারসাম্য ও রঙের ছন্দোময় আকর্ষণ যে-কোনো দর্শকরুচির পক্ষেই গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। এস. এম. সুলতানের ছবি "প্রথম বৃক্ষরোপণ"। এ ছবি শুধুমাত্র দৃশ্যগ্রাহ্যতায় নয়, বিষয়ভাবনায় ভিন্ন মেরুর। আদম-ঈভের যুক্ততা যেন মিশেছে বাঙলার নিজস্ব পরিবেশের শরীরী অনুভবে। ফলে পেশীবহুল মাংসল স্ত্রী-পুরুষ এমনকী দেবদূতও যেন মাটির মানুষ। শিল্পীর ছবির রেখা সম-মাত্রায় শরীরী গঠনকে সুডৌল নকশায় বেঁধেছে, ফলে গঠনের ছন্দোময় অভিব্যক্তি চাক্ষুষী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। শাহাবুদ্দিন আহমেদের ছবির নাম "মুক্তি-যোদ্ধা"। এই ছবির বাস্তবতা পূর্বোক্ত ছবিগুলির তুলনায় ভিন্নধর্মী, কারণ এখানে নামের তাৎপর্য এক বিশেষ সময়ের বা আবহের সূত্রসন্ধানে ব্যাপৃত। অথচ উপস্থাপনার নাটকীয় গতি বিশেষ উল্লেখ্য। স্বাস্থ্যবান মানুষের ধাবমান ভঙ্গিতে রয়েছে এগিয়ে চলার শপথ। প্রত্যয়ে টানটান। মুখ আর হাঁটুর নিম্নাংশ ঈষৎ আভাসিত অদৃশ্য। রূপকের আড়ালে অভীষ্ট বক্তব্য প্রকাশে এ ছবি সার্থক।

বাস্তব দৃশ্য যখন চোখের দেখার মধ্য দিয়ে মনের ক্রিয়াশীলতায় অঙ্গীভূত হয়, তখনই গড়ে ওঠে রূপারোপে অন্যতর অভিব্যক্তি। চেনা দৃশ্যপট অচেনা রঙ-রেখার অপার্থিব মায়ায় জড়ায়। যেমন আনোয়ারুল হকের "অনুস্মৃতি", শফিউদ্দিন আহমেদের "মাছধরা জাল", রশীদ চৌধুরীর "কিষানী",

কাইয়ুম চৌধুরীর "নিসর্গ", দেবদাস চক্রবর্তীর "গঠন", হাশেম খানের "কাক এবং সবুজ", রফিকুন নবীর "মাছধরা ছিপ", ফরিদা জামানের "মাছধরা জাল" এবং কে. এম. এ. কাইয়ুমের "প্রকৃতি-৩" প্রভৃতি ছবিতে নামের সঙ্গে বাস্তব সাদৃশ্য কোথাও সামান্য ইঙ্গিতে আভাসিত। আবার কোথাও যেন বিমূর্ত স্রোতের টানে চেনা চিহ্নের থেকে দূরগামী।

যেসব ছবি সাদৃশ্যে নয়, আধুনিক শিল্পতত্ত্বের অনুভবে সোচ্চার—যেমন, মহম্মদ কিবরিয়ার "চিত্র-৩", আমিনুল ইসলামের "বৃত্তাকার (জন্ম)", আবদুর রাজ্জাকের "অন্তবর্তী", মূর্তজা বশীরের "সমীরণ", সৈয়দ জাহাঙ্গীরের "আত্মা অনুসন্ধানী", কাজী আবদুল বাসেতের "চিত্র-৮৬", শামসুল ইসলাম নিজামীর "সর্বশক্তিমান", আবুতাহেরের "আগন্তুক", মাহমুদুল হকের "ভালোবাসা", কাজী হাসান হাবিবের "অবহেলা", মোমিনুল রেজার "শব্দহীনতা", হাসি চক্রবর্তীর "স্বাধীনতার দৃশ্য" প্রভৃতি ছবিতে নামকরণের সহজতা গঠনের গাণিতিক রীতির সঙ্গে সব সময় সাযুজ্য রক্ষা করে না। কারণ, শব্দগত অর্থের যে নিশ্চয়তার দৃশ্যকল্প প্রচল ধারণায় ফুটে ওঠে, তার থেকে শিল্পীর চিন্তা ও নির্মাণের রীতি পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য বেশিমাত্রায় নির্বাক ব্যঞ্জনাময়। ফলে শব্দার্থ গঠনের দৃঢ়বদ্ধ ও চূড়ান্ত দ্যোতনাকে ছুঁতে পারে না।

ছাপের ছবির ক্ষেত্রে, মনিরুল ইসলামের "প্যাপিরাস", কালিদাস কর্মকারের "প্রতিচ্ছায়া-১", আবদুস সাত্তারের "প্র্যাট-এর জানালার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন"—নামের ছবির প্রতিটিই এচিঙ। কারুগত দক্ষতা এবং বিষয়ের অনুভব ও উপস্থাপন দৃষ্টিনন্দনই শুধু নয়, চিত্রগত সাফল্যেও উত্তীর্ণ। যেমন প্রথম এচিঙটি একটি অতীত ইতিহাসের স্মৃতিবাহী ছেঁড়া পাতা আর এই পৃষ্ঠার বুকে মুদ্রিত যেন বিবর্ণ সময়ের তথ্যের নানা ধারাচিত্রের ভাষ্য। টুকরো-টুকরো ঘটনার ফসিল চিত্রে রঙের অমিত বর্ণপাতে যেন বিবর্ণতার ইঙ্গিতবাহী। অবশ্য এসব আখ্যান মূলত আধুনিক রূপারোপের ছদ্মবেশ। প্রকৃতপক্ষে এই চিত্রনির্মাণে লুকিয়ে আছে পটের ক্ষেত্র-বিভাজনের গাণিতিক ভারসাম্য, রঙের সমানুপাতিক ব্যবহার এবং অনুভবের একান্ত ছন্দোময় ব্যঞ্জনা। আবদুস সাত্তারের এচিঙের নামকরণে অবশ্যই নব্যতার সঙ্গে মিশেছে অনুভবের আন্তরিকতা। আনুভূমিক তিন পাল্লার কাচের জানালার ভিতর দিয়ে দেখা দূরগামী প্রকৃতির রূপাভাস। মনের ওপর পতিত প্রভাবের ব্যক্তিক দৃশ্য-কল্প; তবু উপস্থাপনের গুণে, বর্ণ-ব্যবহারের আকর্ষণে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। কালিদাস কর্মকারের "প্রতিচ্ছায়া"-য় বড়ো আয়তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে টুকরো-টুকরো ক্ষেত্র স্থাপনা এবং তাতে কখনো সাদৃশ্য কখনো বিকৃতির বিমূর্তনায় নানা কাহিনীর ছায়াপাত ঘটিয়েছেন। অথচ রঙ-রেখার সহজ বুনোটে হিমবর্ণপাত ছবি উজ্জ্বল। অবশ্য এ-জাতীয় জ্যামিতিক ছবির বিষয়মাহাত্ম্য অপেক্ষা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখা-রঙের জটিল বিন্যাস আধুনিক শিল্পের ভাষা-জানা রসিক দর্শক যেভাবে গ্রহণ করতে পারবেন, অনভিজ্ঞ দর্শকের কাছে তেমন স্বাদু হয়ে ওঠার সম্ভাবনা-কম।

"নির্বাচিত চিত্রকলা : বাংলাদেশ" সংকলনের এই আলোচনার ভিত্তিতেই সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের চিত্রচর্চার রূপ-রেখার কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছি। ওপার-বাঙলার চিত্রভাবনায় যে-সকল সমস্যা নতুন প্রজন্মের চিত্রকরদের ভাবিত করছে, এপারেও একই সমস্যা বিদ্যমান। এ জাতীয় চিত্র-সংকলনের মাধ্যমে অন্তত ধারাবাহিক ভাবনার চিহ্নপরিচয় যেমন মেলে, পাশাপাশি সময়ের দলিল হিসেবেও বিশেষ মূল্যবান। তবে সার্বিক সাফল্যের পাশে কিছু-কিছু ত্রুটি এই সংকলনে রয়েছে। যেমন, সংকলন-সংগ্রহে যাঁরা উৎসাহী কোন্ মূল্যে এটি সংগ্রহ করতে পারেন, সে সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত নেই। ছবির নামমুদ্রণের বিভ্রাট আছে, যা হয়তো অনিবার্যতার কারণে দুষ্ট বলা যায় না। আর-একটি ত্রুটি ইতিহাসের তথ্য-বিকৃতির দোষে দুষ্ট শিল্পীপরিচিতির ক্ষেত্রে। বিশেষত জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, কামরুল হাসান প্রমুখ স্মরণীয় শিল্পী-ব্যক্তিত্ব যাঁরা অবিভক্ত ভারতে এপার-বাঙলায় শিল্প শিক্ষা করেছিলেন তাঁদের শিক্ষায়তনের নাম প্রসঙ্গে যথেচ্ছাচার করা হয়েছে। বর্তমানে যা সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় নামে খ্যাত, তারই নাম ছিল "স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট", সময় ১৮৫৪ সাল। ১৮৬৪ সালে সরকারি নিয়ন্ত্রণে এলে, এর পরিবর্তিত নাম হয় "গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট"। এই সময় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন মি. লক (১৮৬৪-৮৫)। শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের সময়েই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সেসব অনেক ইতিহাস। তবু প্রাথমিক বা একান্ত প্রয়োজনেই এ-জাতীয় তথ্যের নির্ভুল তথ্য ব্যবহার করা উচিত। অথচ বাংলাদেশের সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত চিত্রকলাসম্ভারে 'কলকাতার সরকারি চারু ও কারুকলা বিদ্যালয়' বা পরবর্তী সময়ে মহাবিদ্যালয়কে শিল্পীপরিচিতিতে কোথাও 'সরকারি চারুকলা ইন্সটিটিউট' নামে কখনো 'সরকারি আর্ট ইন্সটিটিউট' বা 'কলকাতা আর্ট ইন্সটিটিউট' নামে যথেচ্ছভাবে বিকৃত করা হয়েছে। ভবিষ্যতের নির্ভুল ইতিহাস রচনায় এ ধরনের বিকৃতি প্রবল বাধাস্বরূপ। শিল্পীপরিচিতির সঙ্গে চিত্র-নির্মাণের সময়-নির্দেশ থাকলে সংকলনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠত। এসব ভ্রান্তি বাদ দিলে, এই উজ্জ্বল চিত্র-সংকলনটি শুধু বর্তমান সময়ের নয়, আগামী দিনের জন্যও এক অনবদ্য প্রকাশন হিসেবে রসিকজনের স্বীকৃতি অর্জন করবে।

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তিনাম স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

ভ্রমসংশোধন : এপ্রিল ১৯৮৯ সংখ্যায় "পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন" রচনায় ওরাওঁদের ব্যবহৃত পবিত্র জল 'নীরদ' ছাপা হয়েছে। শব্দটি হবে—'বীরদ'।

মতামত

১

মননশীলতার মন্বন্তর

ওপার-বাঙলার একজন অধ্যাপিকার জিজ্ঞাসার উত্তরে এপার-বাঙলার অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ "মননশীলতার মন্বন্তর" (চতুরঙ্গ, জানুয়ারি '৮৯) পড়ে স্বাভাবিক কারণেই কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। দুই বঙ্গের বাঙলা ভাষার বুদ্ধিজীবীরা পরস্পর লেখার মাধ্যমে মিলিত হতে উৎসুক, এবং তার সেতুবন্ধনে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার ভূমিকার অবশ্যই প্রশংসা না করে পারছি না। এবং এই নিবন্ধটির বিষয়বস্তু এটাই প্রমাণ করে যে, দেশ ভাগ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ভাগ হয় নি।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই নিবন্ধে সমকালীন জীবনের সামাজিক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এবং তা সমাজসচেতন মানুষের চেতনাকে স্পর্শ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লেখক লিখেছেন : দেশকালনিবিশেষে মানুষ মননশীল প্রাণীরূপে স্বীকৃতিলাভ করলেও ব্যবহারিক জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিই মননশীল নয়। এই তথ্য স্বীকৃত, আমাদের দেশ নিরক্ষরপ্রধান। তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্যেও সাধারণ মানুষ সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন, তাঁরা হলেন লোকশিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষকমণ্ডলী। একটা নিরক্ষরপ্রধান দেশে শিক্ষকদের যে গুরু দায়িত্ব থাকে, বেশির ভাগ শিক্ষক তা যথাযথভাবে পালন করেন না, তার ফলে সমাজের প্রতি প্রান্তে ফুটে উঠছে ঝড়ের সংকেত। আর এই ঝড়ের থেকে তিনি এবং সাধারণ মানুষও রেহাই পাবেন না, এই চিন্তা থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করছেন অর্থের প্রলোভনে। আর ভুলে রইলেন যে, সব দেশে এবং সব কালে শিক্ষা মানুষ তৈরির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম রূপে স্বীকৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি উভয় বঙ্গের দুজন অধ্যাপকের শিক্ষা সম্বন্ধে লেখা থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। কারণ, শিক্ষার ব্যাপারে বলা যায়, দুটি বাড়ির প্রায় একটি অঙ্গন।

স্বদেশে এবং বিদেশে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশি সময় অধ্যাপনা করে যে অভিজ্ঞতার কথা প্রখ্যাত চিন্তাবিদ অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় আমাদের জানিয়েছেন স্বদেশের শিক্ষাবিদদের সম্বন্ধে, তাতে সাধারণ মানুষের চেতনাবোধে শিহরন অনুভূত হয়। তাঁর অভিজ্ঞতা : 'জ্ঞানের চর্চায় ও জ্ঞানের সম্প্রদানে যিনি নিবিষ্টচিত্ত তাঁর পক্ষেই অধ্যাপক হওয়া সঙ্গত। কিন্তু এদেশে সম্প্রতিকালে বেশির ভাগ অধ্যাপক ডিগ্রি এবং চাকরি পাবার পরে জ্ঞানচর্চার কথা প্রায় ভুলে যান। বই পড়েন না, বই কেনেন না, গ্রন্থাগারে তাঁদের কচিৎ দেখা যায়, ডিগ্রি এবং চাকরির জন্যে গবেষণার নামে যা প্রকাশ করেন তাতে কচিৎ মেলে চিন্তার মৌলিকতা অথবা নতুন তথ্য। টিউটেরিয়াল হোম, নোটবুক, দৈনিকে-সাপ্তাহিকে লঘু রচনা, নানা উপায়ে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা—এই সব নিয়ে তাঁরা সদাব্যস্ত। আমাদের অধ্যাপকরা ছাত্রদের পরীক্ষার নামে যে অনুষ্ঠানটি করেন তার স্বরূপ অজ্ঞাত নেই। তাঁরা পরীক্ষক থাকতে চান, কিন্তু নিজেদের যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে গররাজি।'

একই ভাবে ওপার-বাঙলার অধ্যাপক আহমদ শরীফের অভিজ্ঞতা : 'স্বীকার করাই উচিত যে, এ যুগের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সর্বার্থেই বিদ্যা বিক্রয়ের বিপণি মাত্র। অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা ঘরে বাইরে সর্বত্র বেচাকেনা চলছে।'

দুই বাঙলার দুই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদের অভিজ্ঞতার আলোকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে শিক্ষকদের প্রতি এই প্রত্যাশা রইল—আগামী দিনে এ ধরনের তথ্য যেন আমাদের স্মৃতি থেকে বিলীন হয়ে যায়। আমার দেখা শিক্ষকদের দেখে যা বুঝেছি এবং উপলব্ধি করেছি, তাই এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করছি। সামাজিক জীবনে তাঁরা আমাদের সজ্জন ব্যক্তি, তাই তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এখনো অটুট আছে। অশ্রদ্ধার কোনো প্রশ্নই আসে না।

অনিলচন্দ্র সাহা
বাটানগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

২

নেহরুনামা

আপনার প্রখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত (মার্চ ১৯৮৯) অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের "নেহরুনামা" শীর্ষক প্রবন্ধখানি মনোযোগের সঙ্গে পড়লাম।

এই প্রবন্ধটির প্রবন্ধকার সব জায়গায় স্পষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর দু-একটি উক্তির উপর সবিনয় মন্তব্য করছি।

'মাউন্টব্যাটেন নিমিত্তমাত্র'। এই কথাটি মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ভারতকে বিভক্ত করার চক্রান্ত অনেক দিনের। এবং সেজন্য ধর্মের ধুয়ো তুলে মুসলিম লীগকে গোপনে সমর্থন করল হিন্দুর বিরুদ্ধে। হিন্দু-মুসলমান এক হলে ব্রিটিশকে ভারতে থাকতে হবে না—এটা শাসকরা বুঝেছিল। তাই, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যাতে মিলন না হয়, তার চেষ্টা ব্রিটিশ চালিয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে ব্রিটিশ, এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়েছে তারাই। পৃথিবীর বহু দেশেই তো বহুসংখ্যক মুসলমান অন্য-ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বাস করছেন, কিন্তু সেখানে তো রায়ট হয় নি কোনোদিন, তাঁরা তো মুসলিমদের জন্য পৃথক 'হোমল্যানড' দাবি করেন নি। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন হল কেন?

ধুরন্ধর ব্রিটিশ অতিসূক্ষ্মভাবে কাজ করেছে ভারতভাগের অনুকূলে। মাউনটব্যাটেন নেহরুর বন্ধু আর শুভাকাঙ্ক্ষী সাজলেন। দুর্বলচরিত্র নেহরুকে তিনি পূর্বেই বুঝেছিলেন, এবং তাঁর দ্বারাই ব্রিটিশের চক্রান্ত সফল হল।

গান্ধীজীর প্রশ্নে জওহরলালের জবাব : 'আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কাছে নতিস্বীকার করলুম।' এই নতিস্বীকার দুর্বলতার পরিচয় দেয়।

এতদিনের অখণ্ড-ভারতের আদর্শ রাতারাতি জলাঞ্জলি দেওয়া ভালো নেতার কাজ নয়। অন্নদাশঙ্কর রায় কি জানেন, ভারতভাগের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য বড়লাট 'রায়টে'র কথা বলেন? একটু ধৈর্য ধরলেই 'পার্টিশান' অতি সহজেই এড়ানো যেত। বহু শিক্ষিত মুসলমান 'পার্টিশান' চান নি, কারণ 'পার্টিশান'-এর বিষময় ফল তাঁরা বুঝেছিলেন। নেহরু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। মিনু মাসানি লিখেছেন, 'India was partitioned because Nehru wanted to be the Prime Minister.'

১৯৪৬-এর মার্চ-এপ্রিলে ভারতীয় সামরিক অফিসাররা এবং বোম্বের নৌ-বিদ্রোহের তরুণ দেশপ্রেমিকরা গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল ও অরুণা আসফ আলির কাছে নেতৃত্ব চেয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা নেতৃত্ব দিলেন না। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন সৃষ্ট হয়েছিল, সেই অবস্থায় স্বাধীনতা নিলে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীন অখণ্ড ভারত পেতাম। অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সদ্ব্যবহার নেতারা করলেন না কেন? এটি একটি বিরাট প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিহিত আছে নেতাদের প্রকৃত চরিত্র। অহিংসার দোহাই দিয়ে নেতারা ভারতীয়দের কাছে স্বাধীনতা না নিয়ে ব্রিটিশের হাত থেকে নেবেন স্থির করলেন। সাম্রাজ্যবাদী ও শোষক ব্রিটিশের প্রতি আমাদের নেতাদের এমন ভক্তি আর সরল বিশ্বাস ভারতের সর্বনাশের মূল।

নেতাদের দূরদর্শিতার অভাবেই ভারতের অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। জনৈক অর্থবিদের কথা—'ভারত ও পাকিস্তান কোনোদিনই economically and militarily শক্তিশালী রাষ্ট্র হতে পারে না।' পার্টিশান না হলে হতে পারত।

আমাদের সেনানীরা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করতে নেতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন : 'It is violence. It is chaos. It is not peaceful.' গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের 'অহিংস' ও শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বাধীনতালাভের একটা নমুনা দিচ্ছি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে একমাত্র পানজাবেই নিহতের সংখ্যা ৬ লক্ষ, অপহৃতা নারীর সংখ্যা ১ লক্ষ। সর্বসমেত বাস্তুচ্যুত প্রায় দুই কোটি। এই হল অহিংসানীতির কীর্তি।

নেহরু ছিলেন মাউন্টব্যাটেনের 'obedient boy'. তাঁর কথামতো নেহরুজী চলায় ১৯৪৭ সাল থেকে আজ অবধি কাশ্মীরের ভারত-ভূখণ্ডে ১২ হাজার বর্গ. কিমি পাক সেনাবাহিনীর দখলে। বিদেশী সৈন্যকে দেশ থেকে না তাড়িয়ে আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়েছিলেন নেহরুজী—কোন্ যুক্তিতে? এরূপ ঘটনার নজির কি ইতিহাসে আছে?

১৯৪৬ সালে জওহরলাল নেহরু সিঙ্গাপুরে INA-র War Memorial-এর স্থানে মাল্যদান করবেন ঠিক ছিল। তাঁর অপেক্ষায় ১ লক্ষ ভারতীয় অপেক্ষা করছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের আদেশক্রমে নেহরু শেষ পর্যন্ত সেই স্থানে যান নি।

গান্ধী এবং নেহরু ভারতের চেয়ে এবং ভারতের স্বাধীনতার চেয়ে ভালোবেসেছিলেন ব্রিটিশকে; তাই ব্রিটিশের প্রতি ছিল সহানুভূতি এবং ব্রিটিশের সম্মান রক্ষার জন্য ছিলেন বদ্ধপরিকর। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বোক্ত স্বাধীনতা হাতে তুলে দিলেও নেন নি (১৯৪৬)। দ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ তাঁদের উক্তি উদ্ধৃত করছি : We do not

seek our independence out of Britain's ruin. That is not the way of non-violence. Launching a civil disobedience campaign at a time, when Britain is engaged in a life and death struggle, would be an act derogatory to India's honour.'—জওহরলাল নেহরু।

দুটো উক্তিই ১৯৪০ সালের। গান্ধীজী বলেছিলেন, 'If the Congress wants to divide the country, it should be over my deadbody.'

কিন্তু গান্ধীজী পার্টিশান রদের জন্য কিছুই করলেন না। তাঁর mysterious নীরবতা তাঁর চরিত্রের integrity সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। কথা আর কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না নেতার? আর নেহরু বলেছিলেন, কালোবাজারি, ভেজালকারীদের 'nearest lamppost'-এ ফাঁসি দেবেন। একটিকেও দেন নি, বরং তাঁর রাজত্বে এদেরই রমরমা ব্যবসা। নেহরুর কথায় আর কাজে আরও অসামঞ্জস্য। বর্তমানের দুর্নীতি, ঘুষ, ভেজালের দেশ ভারতবর্ষ নেহরুর legacy। তাঁর প্রশ্রয় পেয়ে এসব বেড়েই চলেছিল; এখন control-এর বাইরে।

নেহরুজী দ্বিজাতিতত্ত্ব মানেন নি। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে দুটো দেশ মানলেন? নেহরুর আর-একটা contradiction।

হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার
জগাছা, হাওড়া

৩

মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে

'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯৮৯) খাজিম আহমেদ লিখিত "মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রম—পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি" নামক পর্যালোচনাটি পড়লাম। লেখক পাঠক্রমের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে খুঁটিনাটি আলোচনা করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু ওই পাঠক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতারূপে আমার দু-একটি বক্তব্য আছে। প্রথমত, পর্যালোচনার গোড়াতে "ভূমিকা" অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি যে বাক্যগুলি চয়ন করেছেন, তার কয়েকটির সঙ্গে আমার লেখা "স্বদেশের ইতিবৃত্ত" (দ্বিতীয় খণ্ড, দশম শ্রেণী)-এর ভূমিকার মিল রয়েছে। পংক্তিগুলি হল—'একদা ব্রিটিশ দার্শনিক কার্লাইল মন্তব্য করেছিলেন ইতিহাস খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনগাথা'—'কিন্তু এখন ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা একমাত্র বিচার্য বিষয় বলে গণ্য করা হয় না।' 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের গতিরেখা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।' লেখক পংক্তিগুলি তাঁর ভূমিকায় বসালেন কেন বুঝতে পারলাম না।

দ্বিতীয়ত, উপসংহারে তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে—(১) রক্ষণশীল বা সনাতনবাদী ধারা, (২) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারা। তাঁর মতে, 'স্পর্শকাতর বিষয়গুলিতে সনাতনবাদী ধারা কিঞ্চিৎ প্রাধান্য পেয়েছে।' এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হল—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারা বলতে লেখক কী বুঝেছেন? বিজ্ঞানসম্মত ধারার অর্থ নিশ্চয়ই খোলা মনে তথ্যের বিশ্লেষণ—কোনো একপেশে সুপরিকল্পিত মতামত চাপিয়ে দেওয়া নয়। নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এক মৌল উপাদান হল সাম্প্রদায়িকতা। এই উপাদানটির তথ্যনিষ্ঠ প্রকৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তা না করে 'স্পর্শকাতর' বলে এই উপাদানটিকে লঘু করে দেখা হল ইতিহাসের বিকৃতি বা বিচ্যুতি। অথও জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন কংগ্রেস নেতারা 'পাকিস্তান' নামক বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক প্রক্রিয়াকে প্রথম দিকে আমল দেন নি, অথবা এর গুরুত্ব ও ভয়াবহ পরিণাম বুঝতে পারেন নি। অন্যদিকে চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতাকে (সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িতাকে বাদ দিয়ে নয়) লঘু করে দেখানো প্রগতশীলতার অপলাপ মাত্র। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কিভাবে গণসংগ্রামকে দুর্বল করে ভারতীয় রাজনীতিতে বামবিকল্পের ক্ষতিসাধন করেছিল, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই? যুক্তিনিষ্ঠ, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-চর্চার স্বার্থে কোন বিচ্যুতিকেই অবহেলা করা উচিত নয়।

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়
বিধাননগর, কলকাতা

গাদিয়ারা

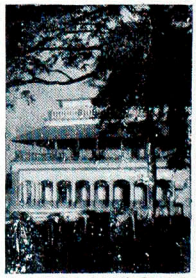

কলকাতার কাছেই গাদিয়ারা, শান্ত, নির্জন, হুগলী আর রূপনারায়ণ মিলেছে এখানে।
গাদিয়ারার ট্যুরিস্ট লজে রয়েছে ১১টি দুই শয্যার ঘর, আর একটি ৬ জনের ডর্মিটরী।
কলকাতা থেকে মাত্রই ৯০ কিলোমিটার। বাগনান পর্যন্ত আসুন ট্রেনে। তারপর বাসে শ্যামপুর হয়ে গাদিয়ারা। এছাড়া এসপ্লানেড থেকে বাসে চেপে নূরপুর, ওখান থেকে মোটরবোটে খুব কম সময়ে একেবারে গাদিয়ারা।

বিশদ বিবরণ ও বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন—

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন
৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (পূর্ব)
কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন- ২৮-৫৯১৭
গ্রাম-ট্রাভেলট্রিপস

পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ADRCAN